পিতা-পুত্রী

পিতা-পুত্রী

নন্দিনী দেবী

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ
প্রথম প্রচ্ছদের ছবি—শ্রীপ্রকাশ কর্মকার,
'প্রতিক্ষণ'-এর শ্রী প্রিয়ব্রত দেবের সৌজন্যে
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি— শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র সৌজন্যে

আমার মা
স্বর্গতা প্রতিমা দেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ভূমিকা

পুপে (নন্দিনী দেবী), তাঁর শৈশবস্মৃতি থেকে পিতা রথীন্দ্রনাথ এবং মাতা প্রতিমা দেবী সম্পর্কে বলছেন। সেইসঙ্গে দাদামশায় রবীন্দ্রনাথের কথাও কিছু বলেছেন। সে সব কথা তিনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। শুনতে আমার বেশ ভাল লেগেছে। আপনাদেরও ভালোই লাগবে। পুপে আবার আমাকে অনুরোধ করেছেন শুরুতে দু'কথা বলতে। তাই সামান্য একটু বলছি। সেটুকু তাহলে গোড়াতেই শুনে নিন।

পুপে কথাটি বাংলা নয়, ফরাসী। যে কন্যাটির নাম সেও বাঙালী নয়, সে গুজরাটী। কথাটির মানে পুতুল। সার্থক নাম বলতে হবে। দেখতে ঠিক যেন একটি ডল-পুতুল। টুকটুকে রং, ফুটফুটে চেহারা। পুরোনো দিনের আশ্রমবাসীদের মুখে শুনেছি—কী মিষ্টি দেখতে যে ছিল সে বলবার নয়। সকলের আদরের সামগ্রী। কিন্তু শিশুর পক্ষে যাঁর আদর-যত্ন সব চাইতে বেশি প্রয়োজন সেই মা কঠিন রোগে আক্রান্ত, সন্তান পালনে অক্ষম। রুগ্ণা স্ত্রী এবং নবজাত শিশুটি নিয়ে পিতা বিব্রত, বিভ্রান্ত। সুখের বিষয় সেদিনের আশ্রমে আপন-পর ভেদ ছিল না। আশ্রম গৃহিণীরা সকলেই শিশু কন্যাটির তত্ত্বাবধানে এগিয়ে এসেছেন। আশ্রম-কন্যা আর কাকে বলে?

কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী আশ্রমে সর্বজনের বৌঠান, কার্যত আশ্রমমাতা। সকলের প্রতি অকৃপণ মমতা তথাপি মাতৃ-হৃদয়টি তৃষিত।

রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী নিঃসন্তান। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভাবছেন, আহা এমন নয়নলোভন স্নেহ-পুত্তলীটিকে পেলে ঘরটি আলো হত, মনটি ভরত, বুকটি জুড়াত। পিতা-মাতার সম্মতি যদি পাওয়া যায় তাহলে এ মুহূর্তেই কন্যাটিকে তাঁরা বুকে তুলে নেন। সম্মতি পাওয়া গেল। কেননা, বুঝতে তাঁদের বিলম্ব

হয়নি যে মায়ের জীবন বিপন্ন হলে সন্তানের জীবনও বিপন্ন।

এইটুকুই আদিকথা। পুপেরাণী পরম সমাদরে অধিষ্ঠিত হলেন শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে। এখন পিতা-মাতা যতখানি নিশ্চিন্ত, প্রতিমা দেবী রথীন্দ্রনাথ ততখানি আনন্দিত। স্বয়ং রবীন্দ্রাথ পুলকিত। এই তো তিনি চেয়েছেন—পরকে আপন করতে, দূরকে নিকট। শান্তিনিকেতন জীবনের সঙ্গে এর একটা মিল আছে। শুধু পঠন-পাঠন নিয়ে শান্তিনিকেতনের জীবন নয়। অনেক রকমের চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়ার দাবি মিটিয়ে তবে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হয়।

পুপে বলতে গেলে পেল নবজন্ম, প্রতিমা দেবী এবং রথীন্দ্রনাথ পেলেন এক নতুন জীবনের স্বাদ। প্রতিমা দেবীকে সবাই দেখেছেন আতিথ্যপরায়ণা গৃহিণীরূপে, দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য অতিথি-আপ্যায়নে ব্যস্ত। পুপের কল্যাণে তাঁকেই আবার দেখা গেল স্নেহপরায়ণা মাতৃমূর্তিতে। রথীন্দ্রনাথ কর্মব্যস্ত, স্বল্পভাষী মানুষ। কথাবার্তায় খুব একটা হৃদয়াবেগের প্রকাশ ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে ফল্গুধারার ন্যায় অতখানি যে স্নেহমমতা প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা কারো জানা ছিল না। কন্যার সকল রকমের আবদার মিটিয়েছেন পিতা রথীন্দ্রনাথ।

এর উপরে উপরি পাওনা হল দাদামশায় রবীন্দ্রনাথের আদর। বিশ্বজোড়া যাঁর খ্যাতি তাঁর কোল জুড়ে বসেছেন পুপেরানী। এমন সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! দাদামশায় নাম দিয়েছেন নন্দিনী। রাজেন্দ্রনন্দিনী নয়, রথীন্দ্র-নন্দিনী।

আনন্দদায়িনী হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরও হৃদয়-নন্দিনী। শিশুর জন্যে কবিতা কবি আগেও লিখেছেন (সেখানে খোকার আধিপত্য)। খুকীর স্থান হয়নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন, ও সব কবিতা যখন লিখেছেন তখন খোকা মহারাজই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

এতদিনে খুকু-মহারাণী সেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিন বছরের প্রিয়ার মন পাবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল। মুখে মুখে ছড়া বানিয়েছেন নাতনীর মনোরঞ্জনের জন্যে, কখনো বানিয়ে-বানিয়ে গল্প বলেছেন, নাতনীর হুকুমে। সমস্তই জমা আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডারে। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে পরোক্ষভাবে নন্দিনীরও কিঞ্চিৎ অবদান আছে।

সেদিনের একরত্তি মেয়ে পুপে একদিন বড় হলেন। দাদামশায় বলেছিলেন 'তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।' তাই হল, বিয়ে-থা করে পুপে

সংসারী হলেন। স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি নিয়ে পুপের আজ জমজমাট সংসার। সেই পুপে আপনাদের কাছে বলছেন তাঁর নিজ জীবনের কথা। কতোখানি পেয়েছেন দাদামশায়ের কাছে, কতখানি মাতা প্রতিমা দেবীর কাছে, কতখানি পিতা রথীন্দ্রনাথের কাছে, আর সব মিলিয়ে কি পেয়েছেন শান্তিনিকেতনের কাছে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূরবী
শান্তিনিকেতন
২২ অক্‌টোবর ১৯৮৪

আমার দাদামশায়

নন্দিনী নাম দিয়েছিলেন আমার দাদামশাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। নন্দিনী ছাড়াও আরও কত নামে যে তিনি আমাকে ডাকতেন তার ঠিক নেই। পুপে, পুপমি, রূপসী, উর্বশী, রম্ভা, মাদাম পাভ্‌লোভা দি সেকেণ্ড, মেনকা, তিলোত্তমা এমনি অসংখ্য নাম দিয়েছিলেন তিনি আমার। নিত্য নতুন নতুন নাম পেতে আমারও কম ভাল লাগত না।

কিন্তু কবে যে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম জানি না। শুনেছি আমার বয়স যখন দশ মাস সেই সময় আমার বাবা-মা আমাকে রথীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমি শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে মানুষ।

আমার বাবা, মা ছিলেন গুজরাটের কাছের মানুষ। বাবা চতুর্ভুজ দামোদর ছিলেন সেখানকার ব্যবসায়ী। তিনি দাদামশায়ের ভক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়া আসা। পরে শান্তিনিকেতনে তাঁরা বহুদিন ছিলেন।

আমার (জন্মদাত্রী) মা ছিলেন চিররুগ্‌ণা। একদিন আমার চিররুগ্‌ণা, অসুস্থ (জন্মদাত্রী) মায়ের কোল থেকে আমার (নবজন্মদাত্রী) নতুন মা রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী আমাকে মায়ের অপত্য স্নেহাদরে গ্রহণ করেন। আমি তখন অত্যন্ত অসুস্থ। বাঁচবার কোন আশা ছিল না। আমার মা প্রতিমা দেবী আমাকে কোলে করে সবার আগে আমার দাদামশায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এসে আমাকে গ্রহণ করার অনুমতি চেয়েছিলেন।

এ সমস্ত কিছু পরে আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। উত্তরায়ণে ঠাকুর পরিবারে যখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম তখন আমি নন্দিনী। সত্যি কথা

বলতে কি সেও আর এক স্বপ্নের জগৎ ছিল আমার কাছে।

যতদূর মনে পড়ে ১৯২২ সালে আমি কবিগুরুর পরিবারভুক্ত হই। এবং এই সালেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। ঠাকুর পরিবারে আমারও প্রতিষ্ঠা হয় নতুন করে।

কিন্তু আমার (নবজন্মদাত্রী) নতুন মা প্রতিমা দেবীও খুব শক্ত সমর্থ ছিলেন না। তাই মায়ের সান্নিধ্য যখন কম পেয়েছি, বাবা, দাদামশাইয়ের সান্নিধ্য তখন বেশী করে পেয়েছি। মা, বাবা, দাদামশাই এই তিনজনের সান্নিধ্যে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছি।

কিন্তু সকালে বাবা যখন বাইরে, মা ঘরের কাজে ব্যস্ত আমি তখন মার চোখ এড়িয়ে দাদামশাইয়ের পড়ার ঘরে গুটি গুটি হাজির। তিনি তখন এতটুকুও বিরক্ত হতেন না। বরং তিনি লেখা থেকে মুখ তুলে আমাকে সাদরে কাছে টেনে নিয়ে, তারপর মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে আদর করতেন। কখনো বানিয়ে গল্প বলতেন। তাঁর লেখা পড়ে থাকতো, তিনি আমাকে বসিয়ে গল্প শোনাতেন। ভোরে উপাসনা সেরে দাদামশাই পড়ার ঘরে এলেই আমি সেখানে হাজির হতাম। উত্তরায়ণে তখন কেউ জাগত না। দাদামশাইয়ের কাছে গেলেই মিলত কফি আর বিস্কুট। একদিন ভোরে দাদামশাইয়ের ঘরে যেতেই দেখি দাদামশাই আমাকে দেখে খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠেছেন। পাশে বনমালীদা কী যেন করছে। আমি আরও কাছে যেতেই দাদামশাই বলে উঠলেন, অন্ধকারে দেখতে পাইনি দিদি, দোয়াতটা উল্টে গেছে। দেখি দাদামশায়ের জোব্বায়, টেবিলে কালি পড়েছে। আমি বলে উঠলাম, এ কি দাদামশাই তোমার জোব্বায় কালি লেগেছে যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বনমালী টেবিলটা মুছে দিক, আমি জোব্বাটা পাল্টে আসি বলে দাদামশাই ব্যস্ত হয়ে জোব্বা পাল্টাতে গেলেন। দাদামশাই আমাকে দেখে এমন ভাব করতেন যেন আমাকে ভীষণ ভয় পান।

একবার ম্যালেরিয়ার খুব প্রকোপ চলছে চারিপাশে। দাদামশাইয়ের শরীরটাও ভাল নয়, মাঝে মাঝে জ্বর আসছে। কিন্তু দাদামশাই ইনজেকসন নিতেন না। আমারও ইনজেকসনে খুব ভয়। সকালে সেদিন কয়েকটা জরুরী চিঠিপত্র লিখেছেন। নিজের হাতে পোস্ট করবেন বলে তৈরী। এমন সময় দেখি, আশ্রমের ডাক্তারবাবু, মাথায় টুপি, সাইকেল চড়ে উত্তরায়ণে ঢুকছেন। আমি ডাক্তারবাবুকে ঢুকতে দেখে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে দাদামশাইকে বললাম, দাদামশাই তুমি শিগ্গির বাথরুমে লুকিয়ে পড়, ডাক্তারবাবু এসেছেন তোমাকে ইনজেকসন দিয়ে দেবেন। আমার কথা শুনে

দাদামশাইতো বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু এদিকে মুশকিল হল কি ডাক্তারবাবুও দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে বসে রইলেন। নড়বার নাম নেই। ডাক্তারবাবু, দাদামশাই কোথায় জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম, নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ওঠার নাম নেই। হেসে বললেন, একটু বসি, এসে পড়বেন। আমি দাদামশাইকে ইনজেকসনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম, দাদামশাই এখন আসবেন না। কিন্তু ডাক্তারবাবু নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুকে বসে থাকতে দেখে দাদামশাই বের হয়ে এলেন বাথরুম থেকে। আমি দাদামশাইকে বের হয়ে আসতে দেখে হতাশ হয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু আমার মুখের করুণ অবস্থা দেখে বললেন, কী হল. পুপেদিদির—দাদামশাই তখন বললেন, আমাকে ইনজেকসনের হাত থেকে বাঁচানো গেল না বলে পুপেদিদির কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, না, না আমি ইনজেকসন দেব না। বলে, দাদামশাইকে একটু পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপসন করে চলে গেলেন। দাদামশাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাগ্যে তুমি ছিলে পুপেদিদি, তা না হলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই আমাকে ইনজেকসন দিয়ে দিতেন।

দাদামশাইয়ের তখন আমার সব কিছুতেই লক্ষ্য ছিল। এমনকি আমার জন্য একটা নতুন খেলনা এলেও সে খবরটাও দাদামশাইয়ের কাছে পৌঁছে যেত।

তখন দাদামশাই নীচে থাকতেন। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হত বলে উপরে যেতেন না। একদিন দাদামশাইকে বললাম জানো, আমার কতো খেলনা। আলমারী ভর্তি। দাদামশাই হেসে বললেন, সব খেলনাগুলো ঠিক আছে তো দিদি? উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, প্রায়ই সব ঠিক আছে। শুধু ক'টা পুতুলের নাক নেই, কয়েকটার কান নেই। একটার একটা পা ভেঙে গেছে। কিন্তু তুমি কি করে সব জানতে পারলে? দাদামশাই হেসে বললেন, সব জানতে পারি যে দিদি।

একবার পাখী পোষার শখ হয়েছিল আমার। দাদামশাইকে সে কথা বলতে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ পুষবে বৈকি দিদি। তবে খাঁচার মধ্যে নয়। খাঁচায় রাখলে পাখীদের খুব কষ্ট হয়। আমি তাঁর কথা মত একটা ময়না পাখী পুষেছিলাম। সে পাখীটা বাইরে ছাড়া থাকতো। ডাকলেই গাছের ডাল থেকে উড়ে এসে আমার হাতে বসত। তাকে আদর করতাম। খাওয়াতাম, আবার ছেড়ে দিতাম। সে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরে বসে থাকতো। দাদামশাইকে সেই পাখীর কথা বললে তিনি খুব খুশী হতেন। প্রায়ই ময়নাটার কথা জিজ্ঞেস করতেন। উত্তরায়ণের ময়ূরটা ছাড়া পেলেই দাদামশাইয়ের কাছে এসে পেখম মেলে দাঁড়াতো। মালীরা তাকে ধরতে এলে দাদামশাই নিষেধ করতেন। পোষা

বেজীগুলো ঘুরে বেড়াতো দাদামশাইয়ের পায়ে পায়ে। আর দেশী কুকুর লালু তো প্রতিদিন দাদামশাইয়ের খাবার সময়ের সঙ্গী ছিল। সকালে চায়ের সময় লালু হাজির না থাকলে দাদামশাইয়ের খাওয়া হত না। এইগুলোর তদারকির ভার ছিল আমার উপর। দাদামশাই বলতেন, দেখো পুপেদিদি এদের যেন অযত্ন না হয়।

মাঝে মাঝে সময় পেলে দাদামশাই আমাকে পড়াতেন। তিনি সাধারণত বিকেলের দিকে আমাকে ডেকে বলতেন পুপেদিদি, তোমার পড়ার বইটা নিয়ে এসো তো দেখি কি পড়ছো। তাঁর কাছে পড়া আর পড়া থাকতো না। তিনি যে পড়াচ্ছেন সে কথা আদৌ বুঝতে দিতেন না। কত শক্ত শক্ত জিনিস কত সহজে তাঁর কাছে শিখেছি।

চেঁচিয়ে পড়লে বলতেন মনে মনে পড়। বলতেন, লিখে লিখে পড়লে ভাল মুখস্থ হয়। শিশুদের পক্ষে শক্ত এমন বিষয় পড়তে বলতেন। বলতেন, তাতে শিশুদের কল্পনাশক্তি বাড়ে। বিকেলে পড়তে পড়তে ক্ষিদে পেয়ে যেত। বলতাম, দাদামশাই তোমার খেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তিনি হেসে বলতেন, হ্যাঁ দিদি তোমার আর ভাল লাগছে না। ছুটি চাই তাই তো।

মাঝে মাঝে একটু গল্প বলে ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, এবার লেখো। আমি লিখতাম। তিনি সংশোধন করে দিতেন। এমনি করে গল্প লেখার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি নিজে ধরিয়ে দিয়েছিলেন ও লিখলে তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন, সেই রকম একটা গল্প হল—

ইঁদুরেরভোজ

ইস্কুলের ছুটির আর হপ্তা দুয়েক বাকি। নন্দীদিঘির পাড়িতে ছেলেদের কমিটি বসে গেছে। তারা মহাক্ষ্যাপা। বিদ্যারতন পণ্ডিতমশায়কে সেক্রেটারিবাবু বিদায় করে দিয়েছেন, তার আমলে ছেলেরা খুব আরামে ছিল। মাসে দুটো তিনটে অতিরিক্ত ছুটি পাওয়া যেত, পঞ্জিকা থেকে বের করতেন নানা রকম ব্রত পার্বণ, ক্লাস দিতেন বন্ধ করে। ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি আর মার্বেল খেলতে হাত পাকিয়েছিল, পড়াশুনোয় বুদ্ধি খেলত না। তারি ফলে দশ পনেরো জন পরীক্ষায় ফেল করলে সেক্রেটারিবাবু বললেন আর চলবে না।

একটি ইস্কুলে অনেকগুলি ছেলে পড়িত। তাহাদের এক পণ্ডিত ছিল, তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছেলেরা যখনই ছুটি চাইত, তক্ষুনি তিনি

ইস্তাম্বুলের পথে জাহাজে বাবা ও আমি

যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তে বুলগেরিয়ার সেলুনের জন্য প্রতীক্ষা—দাদামশায়, মা, রাণী মহলানবীশ ও আমি

ছোট্ট আমি—পুপে

বাবা, মা ও দাদামশায়ের সঙ্গে আমি
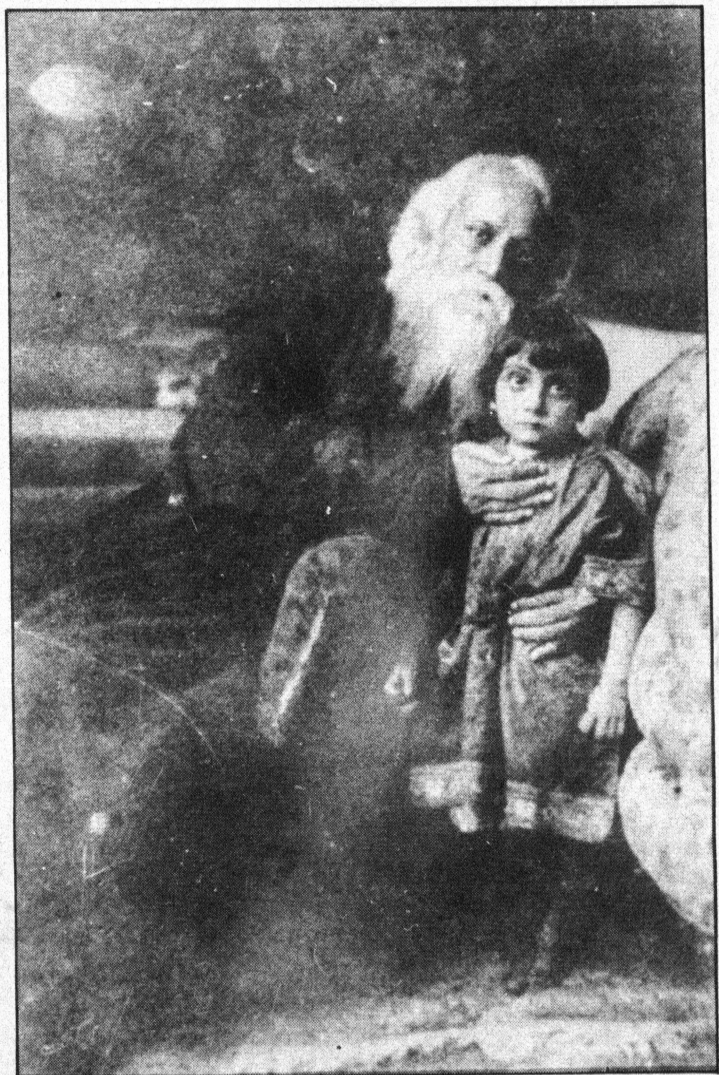
দাদামশাইয়ের সঙ্গে পুপু
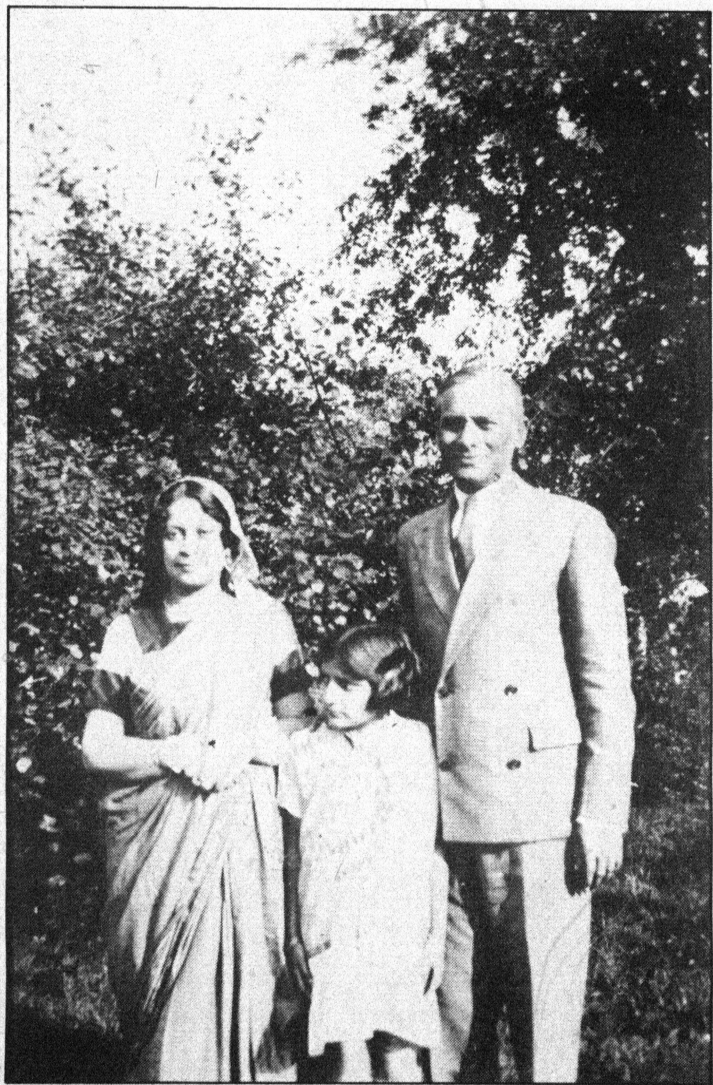
বাবা, মা'র মাঝখানে আমি

'তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে'

শিল্পকর্মে মগ্ন—বাবা রথীন্দ্রনাথ
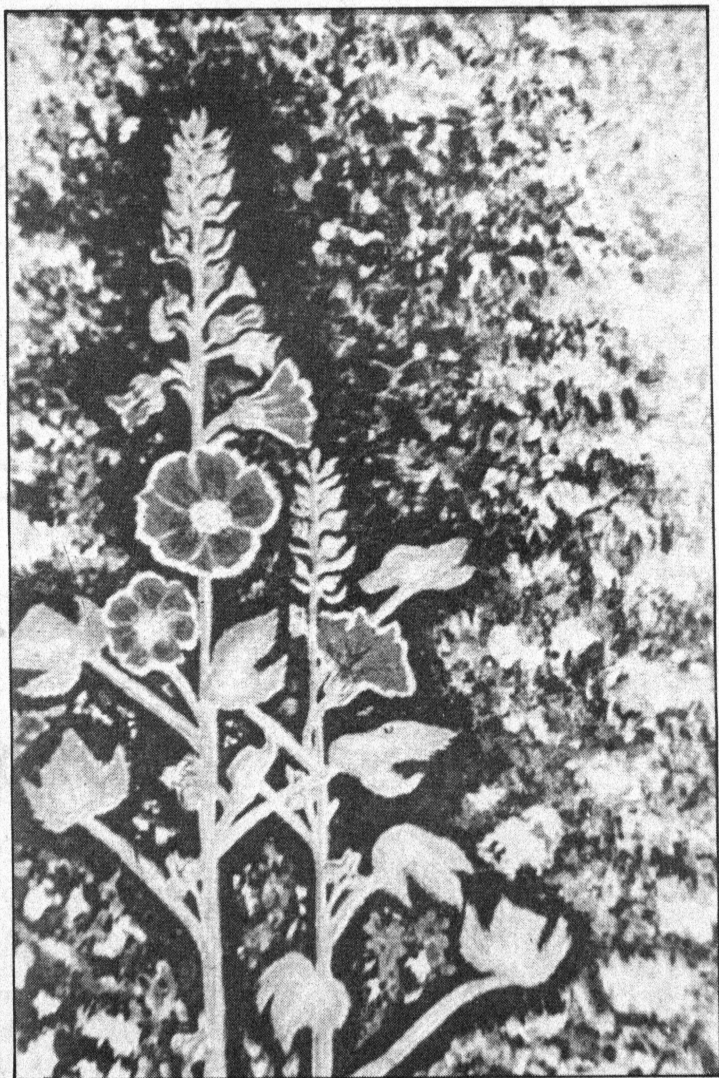
হলিহক ফুল—বাবার আঁকা

বাবার আঁকা ফুলের ছবি
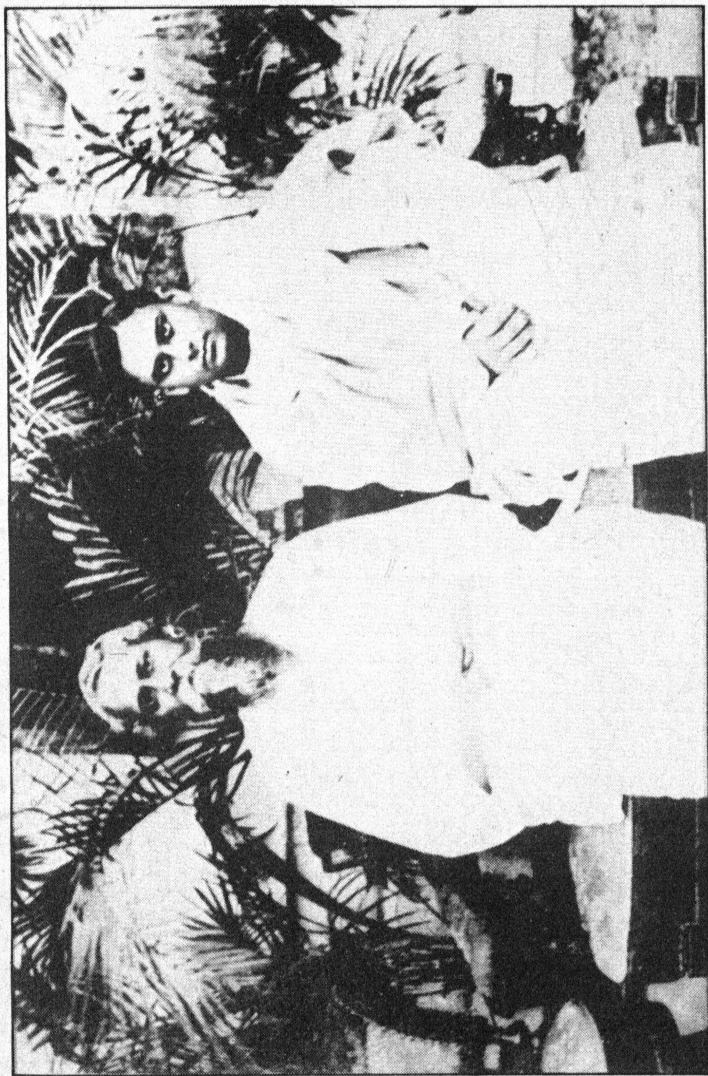
দাদামশায় ও বাবা

বাবা—যৌবনে

তাহাদের ছুটি দিতেন। এর ফলে প্রায় অধিকাংশ দিনই তারা পড়া তৈরী করিত না। একবার ইস্কুলে পরীক্ষা হইল, তাহাতে দশজন ফেল করিল। তখন সেই পণ্ডিতকে ছুটি দেওয়া হল, ছেলেরা অবশ্য তাই জেনে মহা গোলমাল বাঁধাইল কিন্তু কোন ফল হল না।

এর পর গরমের ছুটি হল, ছেলেরা নিজের নিজের বাড়ীতে চলে গেল। দু মাস পর যখন সব ছুটির থেকে বাড়ী ফিরছে, তখন তাদের গাড়ীর ভিতর একজন বৃদ্ধ লোক এক কোণে বসে আছে দেখতে পেল। তখন ছেলেরা তাকে বল্ল দেখ তুমি অন্য গাড়িতে যাও, তখন বৃদ্ধ বলল যে, আমি ত শুধু এক কোণে বসে আছি তোমাদের ত কিছু করছি না। তাহার পর কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল ছেলেরা সমস্ত গাড়ী হল্লা করতে লাগল। তাহাদের ভিতর একটি ছেলে বৃদ্ধর কাছে এসে বল্লে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বৃদ্ধর উত্তর দিলেন, নন্দীপুর গ্রামে, ও আমরাও ত সেখানেই যাচ্ছি আমাদের সেখানে ইস্কুল আছে। আপনি কেন সেখানে যাচ্ছেন। এই আমার কিছু কাজকর্ম্ম আছে। তারপর বৃদ্ধ তার চাদরখানি এক জায়গায় পেতে ঘুমিয়ে পড়লেন। পায়ের কাছে তার ছোট একটি বাকস ও একটি ছোট পুটলিতে কিছু কাঁচা আম ও মিষ্টি বাঁধা ছিল। বৃদ্ধ নিদ্রা যাবার খানিকক্ষণ পর ছেলেরা সেই পুটুলি খুলে কাঁচা আম ও মিষ্টি সব খেয়ে পুটুলিটি আবার যথাস্থানে রেখে দিল। বৃদ্ধর যখন ঘুম ভাঙল তখন ছেলেরা বল্লে আপনি অন্য গাড়ীতে যান, কারণ এ গাড়ীতে ইঁদুরের বড় উৎপাত। বৃদ্ধ হাসিভরা মুখ করে বলেন ইঁদুরেরা আর আমার কি করবে। না না কিন্তু এ পুটুলির ভিতর আপনার যা আছে তা নষ্ট করতে পারে। একবার দেখুন ত পুটুলিটা খুলে।

বৃদ্ধ পুটুলি খুলে দেখলেন যে পুটুলিটা খালি। একটু হেসে তিনি বলেন তা বাবা তোমরা খেয়েছ তা বেশ খুশী হয়েছি। আমার কাছে আরো কিছু আছে যদি তোমরা চাও ত দিতে পারি। বৃদ্ধ তাহার বাক্‌স থেকে আরো কিছু মিষ্টি ছেলেদের দিলেন। এইরকম খানিকক্ষণ গাড়ীতে কাটাবার পর গাড়ী তাহার গন্তব্য স্থানে এসে পোঁছাল। ছেলেরা সব নেমে নিজেদের ইস্কুলে গেল। পরদিন যখন ক্লাসে আসিল তখন তাহাদের সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়কে দেখে তারা তাহাকে চিনতে পারল ও গাড়ীতে তাহার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল তাও মনে পড়ল। সব ছেলেরা ত মাথা হেঁট করে রইল। বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই তখন হেসে বল্লেন, অনেক গল্প ও খাওয়া ত হল এইবার তোমরা একটু মন দিয়ে পড়াশুনা কর। ইস্কুলের শেষে ছেলেরা পরস্পরের ভিতর তাহাদের

পণ্ডিতমশায়ের কথা আলোচনা করতে লাগল।

দীর্ঘদিন আমি শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকলে দাদামশাই আমাকে চিঠি লিখতেন, পুপুমণি, বেশি দেরি করো না। এইবার চলে এসো। তারপর আমি ফিরে এলে চলত অজস্র গল্প। আমিও যত গল্প শোনাতাম, দাদামশাইও তত গল্প শোনাতেন আমাকে।

দাদামশাই চমৎকার ভূতের গল্প বলতে পারতেন। তিনি শুরু করে দিতেন ঐ সে আসছে বলে। তারপর এমন করে গল্পের মধ্যে দিয়ে আমায় নিয়ে যেতেন যে আমার আর অন্য কিছু মনে থাকতো না। একবার দাদামশাইয়ের কাছে ভূতের গল্প শুনছি। দাদামশাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সে এল বলে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমিও গল্পেব মধ্যে ডুবে গেছি। হঠাৎ আমার মনে হল দাদামশাই কোন কথা বলছেন না। সব চুপচাপ। কোন সাড়া শব্দ নেই কাছে গিয়ে দেখি দাদামশাইয়ের চোখ বন্ধ। তখন দাদামশাই ইরিসিপ্লাসে কষ্ট পাচ্ছিলেন। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যেতেন। আমি দাদামশাইকে চুপ করে যেতে দেখে, ডেকে যখন সাড়া পেলাম না তখন কেঁদেকেটে অস্থির। তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। যাতে দাদামশাই প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। অমন রাগতে দাদামশাইকে আর দেখিনি। ঘটনাটা ঘটেছিল দাদামশাইয়ের চিকিৎসার সময় দাড়ি কেটে দেওয়ার জন্য। কলকাতা থেকে ডাক্তাররা এলেন দাদামশাইকে দেখতে। সেই ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ। দিনের বেলায় তাঁরা দাদামশাইকে দেখে তাঁর মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত যন্ত্রণার সঠিক কারণ কি বুঝতে পারলেন না। তাঁরা ঠিক করলেন ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে দাদামশাইকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর দাড়ির ভিতরটা দেখতে হবে। সেই মত দাদামশাইয়ের রাতের খাবারের সঙ্গে গোপনে ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ডাক্তাররা তাঁর কানের কাছের চুল ও গালের কিছু অংশের দাড়ি কেটে তাঁকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। ও ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দাদামশাইয়ের দাড়ির ঐ দশা করার পর তাঁরা আর শান্তিনিকেতনে থাকতে ভরসা পেলেন না। সেই রাতেই তাঁরা কলকাতা পাড়ি দিলেন। এদিকে ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দাড়িতে হাত দিতে গিয়েই দাদামশাই টের পেলেন তাঁর দাড়িতে কিছু হয়েছে। তিনি আয়নাতে মুখ দেখে রাগে অগ্নিশর্মা। বনমালীদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দাড়ির এ দশা হল কীভাবে? বনমালীদা প্রায়

কেঁদে ফেলে বলল, সে ঘুমিয়ে ছিল। সে এসব কিছু জানে না। নিয়মমত ভোরবেলায় কফি খেতেন। কিন্তু সেদিন কিছু খেলেন না। বনমালীদা একবার বলতে গিয়ে ধমক খেল। দাদামশাই তখন আমার বাবাকে ডাকতে বললেন। বনমালীদা একটু পরে ঘুরে এসে বললেন, তিনি একটা জরুরী কাজে ভোরেই শ্রীনিকেতন গেছেন। দাদামশাই আর কোন কথা বললেন না। গুম হয়ে রইলেন। বনমালীদা যতবারই খাবার কথা বলতে এলো ততবারই ধমক খেল। কেউ আর ভয়ে দাদামশাইয়ের সামনে যেতে পারে না। তিনিও কিছু খান না। শেষ পর্যন্ত মা গিয়ে দাঁড়ালেন দাদামশাইয়ের সামনে। বললেন, তিনি না খেলে এখানে তো কেউ খেতে পারবে না। দাদামশাই তবু কোন কথা বলেন না। শেষে মা আবার খাবার অনুরোধ জানাতে তিনি বললেন, কারও কি এতটুকু ভদ্রতাবোধ নেই। আমার দাড়িতে হাত দেবার আগে একবার কি জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না ? প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা কটি বলেছিলেন তিনি। তারপর আবার খেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা ভয়ে কয়েকদিন দাদামশাইয়ের মুখোমুখি হননি। লিখতে বসে অনেক সময় দাদামশাইয়ের সময়ের খেয়াল থাকতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি লিখেই চলতেন। সেই সময় কেউ কিছু বললে তিনি বিরক্ত হতেন। খাবার কথা তো বলাই চলতো না। এমন অনেক দিন হয়েছে তিনি লিখেই চলেছেন। বেলা এগারোটা বেজে গেছে, কিন্তু তাঁর কোন খেয়াল নেই। তখন আমি গিয়ে দাদামশাইকে তাড়া লাগাতাম, বলতাম, দাদামশাই বেলা হয়েছে স্নানে যাও। তিনি হেসে বলতেন, হ্যাঁ এই যে, যাই দিদি। আমি বারবার তাড়া লাগাতাম তিনি যতক্ষণ না লেখা থেকে উঠতেন। তারপর তেল মাখতে মাখতে খবরের কাগজ পড়তেন। আমি থাকলে টুকটাক গল্প করতেন। দু একটা মজার খবর আমাকে সহজ করে বলতেন। তারপর স্নানে যেতেন। মা দাদামশাইয়ের সামনে বসে খাওয়াতেন। পাথরের থালায় দাদামশাইকে খেতে দিতেন মা। দুপুরে খাবার সময় প্রায় দিনই কোন না কোন অতিথি থাকতেন। খাবার টেবিলে নানা রকম আলোচনা হত। সব কথা আমি বুঝতাম না। খেয়েদেয়ে চুপচাপ উঠে পড়তাম। আমি উঠলে দাদামশাই শুধু বলতেন, উঠে পড়লে দিদি। তারপর আবার অতিথির সঙ্গে কথা বলতেন।

দাদামশাই যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন না, তখন খুব নিঃসঙ্গ মনে হত। মনে হত শান্তিনিকেতনটা যেন অনেকখানি নির্জন হয়ে গেছে। তিনি বাইরে গেলে আমি প্রায় দিনই তাঁকে চিঠি লিখতাম। একবার যখন দাদামশাই আর্জেণ্টিনায় তখন আমি দাদামশাইকে খুব যত্ন করে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

বেশী ভাল করতে গিয়ে চিঠিটাতে অজস্র কাটাকাটি হয়েছিল। সেই চিঠিটা দাদামশাই আর্জেন্টিনায় পেয়ে কাটাকাটিগুলোকে একটু সুন্দর করার জন্য তার উপরে আরও কাটাকাটি করেন। সেই কাটাকাটি ও আঁকিবুকিগুলো একটা ছবির আকার নেয়। দাদামশাই সেই আঁকিবুকি করা চিঠিটি ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে দেন আমাকে ওটা আবার পোস্ট করে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেবার জন্য। ভিকটোরিয়া ওকাম্পো তো ছবিটা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ। তিনি ছবিটা সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেন ও দাদামশাইকে বলেন, এটা এমনি পাঠালে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া মাউণ্ট করলে ছবিটা আরও সুন্দর দেখাবে। ছবিটা তিনি নিজের হাতে মাউণ্ট করে তা একটা বড় খামে ভরে মায়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন।

আমার মনে হয় সেই আমার চিঠিতে আঁকিবুকি করে যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন সেই ছবি থেকেই তাঁর ছবি আঁকার সূত্রপাত। আমার এই ধারণার সমর্থন মিলেছিল আমার মায়ের কথায়। মাকে লেখা দাদামশায়ের চিঠির মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে।

আমাকে নিয়ে দাদামশায়ের লেখা

তৃতীয়া[১]

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাঁকে ?
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
বসন্ত তার দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান ;
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে পালিয়ে সে যায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলা,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর, মিষ্টিত ওর গলা ॥

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আম্লকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে এসে বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেনুশাখার তিন বছরের দোল।
তবু, ক্ষণিক রঙ্গ-ভরে হৃদয় করি' লুট
নাচের পালা ভঙ্গ করে' কোন্‌খানে দেয় ছুট
আমি ভাবি, এইবা কি কম, প্রাণে ত ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্ আমার ত মন দোলে।

হৃদয় না হয় নাই বা পেলেম, মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা ত আছে ॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
শরৎ প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্ব দেহে মেলে'
শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশখানি ঢেলে'।
বুঝতে নারি তবু কেন আমার বেলায় ফাঁকি
ভরা নদীর জোয়ার জলে কলস ভরে না কি ?
তবু ভাবি, বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তার ত আছে দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে ॥

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
যাই হোক মোর কীর্তিকলাপ ওর কাছে নাই মান ;
আজ বসেছি তারি দিতে উচিত প্রতিদান।
কেমন যে ওর মনের গতিক জানবে বিশ্বজনে,
এই কবিতা বুঝবে যখন লাগ্‌বে সরম মনে।
ওর আছে এক বাঁদর ছানা, আর আছে এক পুসি,
ঝগড়ু বোকার সঙ্গ পেলে হয় কি বিষম খুসি।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি' ॥

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশ পানে চেয়ে,
আবার হতে কবির প্রিয়া তিন বছরের মেয়ে।
ইচ্ছা হবে, কালো তাহার তরল চাহনীতে
শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।
ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ,
জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।

সাঁওতালিনী, নেপালিনী, সঙ্গী তাহার নানা,
ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা,
ঝগ্‌ড়ু বোকা, বুড়ো মালী, বজায় রইবে সবে,—
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে ॥

দাদামশায়

(বুয়েনাস্ এয়ারিস্
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪)

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া

ফুলের মধ্যে যে আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তার ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হল উপায় আর ফলটা হল উদ্দেশ্য, তাই বলে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখতে পাই নে।

আমার তিন বছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েছে নন্দিনী, তার হওয়ার উদ্দেশ্য কী এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে-যে কুলরক্ষার সেতু, সে-যে পিণ্ডজোগানের হেতু, সে-যে কোনো-এক ভাবীকালে প্রজনার্থং মহাভাগা, এ-সব হল শাস্ত্রসংগত বিজ্ঞানসম্মত মূল্যের কথা। ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যবসাদারের। কিন্তু ভগবান তো সৃষ্টির ব্যবসা ফাঁদেন নি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ, অর্থাৎ, আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হয়ে মিশে গেছে। এইজন্য যে শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিন বছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দগৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্বরচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়ো। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হতে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ; গৌণ কথাটা হচ্ছে সৌন্দর্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে তখন সেই গৌণের সম্পদই সে খোঁজে। বস্তুত, গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা পণ করতে বলে তখন সে প্রজনার্থং মহাভাগার কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবি সৃষ্টিতে বে-হিসাবি

---

১ পূরবীতে প্রকাশিত কবিতার পাঠান্তর। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে লেখা।

আনন্দরূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য বলে জানে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া ষ্টিমার

নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়বার সময় তার এখনো হয়নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই, যে আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম-পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে পড়ে সেই আমার পদবৃদ্ধি হল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারানীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্ছে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে বসেছি। হুকুম হল, 'দাদামশায়, বাঘের গল্প বল'। আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় করে বললুম, 'আমার সমযোগ্য লোক হয়তো জাহাজে এক-আধজন মিলতেও পারে, কারণ যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী'। কিন্তু, নিষ্কৃতি পেলুম না, তখন শুরু করে দিলুম—

এক যে ছিল বাঘ,
তার সর্ব অঙ্গে দাগ।
আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
হল বিষম রাগ।
ঝগ্‌ড়ুকে সেই বললে ডেকে,
'এক্ষুণি তুই ভাগ্‌,
যা চলে তুই প্রাগ্‌,
সাবান যদি না মেলে তো
যাস হাজারিবাগ'।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে প্রকাশিত। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীকে নিয়ে লেখা।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে প্রকাশিত। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীকে লেখা।

দাদামশায়ের চিঠি

Geneve
7, Rue de 1'
Universite

পুপুমণি,

দাদামশায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেবিলে কাগজপত্র ছড়াছড়ি যাচ্ছে, রঙীন কালীর দোয়াতগুলো সমস্ত এলোমেলো—কলম পেন্সিল কোথায় কি আছে তার ঠিকানা নেই। চশমা চোখে থাকে অথচ খুঁজে বেড়ায়। একটা মস্ত ঝোলা কাপড় পরে থাকে, তাতে লাল রং নীল রং হলদে রঙের দাগ। আঙুলে হাতের রঙের দাগ লেগে থাকে, সেই হাত দিয়ে টেবিলে খেতে যায় লোকেরা দেখে মনে মনে হাসে। রোজ রোজ তার সেই এক ঝোলা কাপড়খানা দেখেও তাদের হাসি পায়। ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে তখন আর কেউ ওঠে না। ক্রমে বেলা ছটা বাজে, সাতটা বাজে, আটটা বাজে—তখন আরিয়াম সাহেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্তিরে আপনার ঘুম হয়েছিল তো। দাদামশায় বলে, হাঁ, বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল। তার পরে ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে—খবর পায় পাশের ঘরে খাবার এসেচে। গিয়ে দেখতে পায়, একটা ডিম সিদ্ধ, রুটি টোস্ট, মাখন আর চা। খেয়ে সেই টেবিলে এসে বসে। বসে বসে লেখে। এন্ড্রুজ সাহেব মাঝে মাঝে এসে গোলমাল করে যায়। লোকজন দেখা করতে আসে। বেলা দশটা এগারোটা হয়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে এইবার স্নান করতে হবে। স্নান করে এসে কেদারায় বসে বিশ্রাম করে। তার পরে লাঞ্চ্। শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার

পরে কিছু বিশ্রাম, কিছু কাজ, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা। এমনি করে দিন চলে যায়। সাড়ে চারটের সময় চা। সেই সঙ্গে পাঁচজনের সঙ্গে বকাবকি। তারপর আটটা বাজলে খাওয়া। সেইরকম শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন। লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তার পরে দাদামশায় শুয়ে পড়ে বিছানায়। তার পরে সমস্ত রাত্তির যে কি হয় তা সে জান্‌তেও পারে না। আজ আর সময় নেই।

ইতি ২১ আগষ্ট ১৯৩০

দাদামশায়।

মস্কৌ

পুপুমণি,

আমি কোথায় সে তুমি মনে করতে পারবে না। একটা মস্ত বাড়ি, চমৎকার বাগান, যত দূর চেয়ে দেখা যায় বড় বড় গাছের বন। আকাশে মেঘ করে আছে, খুব শীত, বাতাসে লম্বা লম্বা গাছের মাথা দুলচে। অমিয়বাবু আছেন মস্কৌ শহরে, আরিয়াম গেছেন আর এক জায়গায়, আমার সঙ্গে আছেন ডাক্তার টিম্বার্স। ঘড়ি কাছে নেই কিন্তু বোধ হয় এখন সকাল আটটা হবে। আমি যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম তখন জানলার বাইরে দেখলুম অন্ধকার, আকাশভরা তারা। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলুম। তারপরে যখন অল্প একটু আলো হল বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চিঠি লিখতে বসেছি। প্রথমে বাবাকে একটা বড় চিঠি লিখেচি তারপরে তোমাকে লিখচি। কিন্তু ক্ষিদে পেয়েচে। এখনি হয় তো এখানকার দাসী ডিম রুটি আর চা নিয়ে আসবে। তুমি হয়ত এতক্ষণে জেগেছ, তোমার কোকো খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে গেছ কি ? কিন্তু তোমাদের ওখানে হয় তো মেঘ করে বৃষ্টি হঁচ্চে। আজ বিকেলে মোটর গাড়ী চড়ে এখান থেকে আবার মস্কৌ শহরে চলে যাব। সেখানে একটা হোটেলে আমরা থাকি। এখানকার মতো এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি নয়, আর সেখানে যে খাবার জিনিস দেয় সেও ভালো নয়। তাই ইচ্ছে করে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। এবারে সেখানে ফিরে গিয়ে আর কিছুতেই নড়ব না। কেবল ছবি আঁকব। আর ভোরের বেলা বনমালী গরম কফি আর রুটি টোস্ট্ নিয়ে আসবে। তারপর সেই কাঁকর বিছানো বাগানে বেড়াতে যাব, একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। তারপরে—এখন থাক্। খাবার এসেছে। কি এসেছে বলি। কফি, রুটি, মাখন, মাছের ডিম, দু রকমের চিজ্, ক্রিমের দই আর দুটো ডিম সিদ্ধ। তাছাড়া, আঙুর, পিয়ারা,

আপেল। খাবার হয়ে গেলে পর গরম জলে স্নান করে এসে আবার লিখতে বসেচি। এখন মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে—রোদ্দুর দেখা দিয়েছে, গাছের ডালগুলো বাতাসে নড়চে আর পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে, আর কত রকমের পাখী ডাক্‌চে তাদের চিনিনে। আজকে আর সময় নেই।

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
দাদামশায়।

শান্তিনিকেতন,

পুপুদিদি,

তুমি যখন দার্জিলিং যেতে লিখেচ তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু মা যদি গরম কাপড় না দেয় তাহলে শীতে মরে যাব। তোমার ওভারকোট আমার গায়ে হবে না। ওদিকে সে' এসে আমার বালাপোষখানা গায়ে দিয়ে চলে গেছে। বৃষ্টিতে তার নিজের ছেঁড়া চাদর খানা ভিজে গিয়েছিল সেইটে ফেলে দিয়ে গেছে। বনমালীকে ঐ চাদরটা দিতে চাইলুম সে নিলে না। ওটাকে সরবৎ ছাঁকবার কাজে লাগাব মনে করচি। আমার হলদে রঙের ভালো চটি জোড়াটাও সে নিয়েচে।

ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এলুম। ইলিশ মাছের ডিম ভাজা ছিল সে বললে আমি খাব। তাকেই দিলুম। তবু তার ক্ষিদে ভাঙে না। লাউ দিয়ে বড়ি দিয়ে ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল সেটাও খেলে। তারপরে পায়েস খেলে দুবাটি, শেষকালে দুটো আতা। বলে গেল, চা খাবার সময় আসবে, তার জন্যে যেন নিমকি তৈরী থাকে। নিমকির সঙ্গে দই দিয়ে শসার চাটনি খাবে এই তার ফরমাস।

ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮
'দাদামশায়'

On Board
Houseboat "Padma"
চন্দননগর

পুপুদিদি,

তুমি ভীষণ গরমে শুকিয়ে যাচ্চ খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুই এক পস্‌লা ভালো জাতের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছি—পেয়েছ কিনা খবর দেবে।

১ রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বোধ হয় মাঝে মাঝে আরো কিছু কিছু পাঠাতে পারব অতএব তোমার হংস পরিবারের জন্যে বেশি ভাবনা করো না। আমি এখানে নির্বাসনে আছি, শ্যামলী এখনো আমার আসন প্রস্তুত করে নি—যখন সে তৈরি হয়ে ডাক দেবে আমিও দেরি করব না। হয় তো আরো দু হপ্তাখানেক দেরি হতে পারে। তোমাদের ঘাস তো সব শুকিয়ে গেল সকালবেলায় হাঁস চরাবার জায়গা পাও কোথায়? প্রথম কিছুদিন বোটে ছিলুম—সামনের ঘাটে লোক জমা হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। লিখচি পড়চি খাচ্চি আঁকচি ঘুমোচ্চি সমস্তই তাদের দৃষ্টির সামনে। বাইরে এসে বসলে তারা নৌকোর পাশে এসে ভিড় করে—লুকিয়ে থাকতে হোত কামরার মধ্যে,—শেষকালে এই খাচার থেকে বেড়িয়ে পড়তে হোলো। এখন আছি গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে—চারিদিক খোলা, গঙ্গা একেবারে গা ঘেঁষে চলেছে—আরামে আছি। লোকজনের সমাগম সম্পূর্ণ নেই তা বল্‌তে পারিনে। সদর দরজা বন্ধ করে তাদেয় কতকটা ঠেকানো যায়। আম এক ঝুড়ি বোধ করি পেয়েছ—কিছু খেয়ো কিছু বিতরণ কোরো। ইলিশ মাছ পাঠাবার চেষ্টায় আছি।

ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

'দাদামশায়'।

১৯৩১

পুপুমণি

আষাঢ় ১৩৩৮

বেশি দেরী করো না। এইবার চলে এস। কেননা পাণ্ডবদের এবারে খুব মুস্কিল। বন থেকে ফিরে এল। তেরো মাস কেটে গেল।

কিন্তু দুষ্টু দুর্যোধন বল্‌চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেবো না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাকবে। ভীম তাহলে ছট্‌ফট্‌ করে মরবে। তার গদা দেয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেছে। সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বলে উঠচে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়।

অর্জুনের ইচ্ছে আর একটুও দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটি ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে—কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই। ধীরেন কাকা থেকে থেকে পাল্লারামের পেটে ফাউণ্টেন পেনের খোঁচা মারছে, পাল্লারাম চেঁচিয়ে উঠচে। দিন্‌ দা থাকলে পাল্লারামের রক্ষা ছিল না। বনমালীর মাথায় সেই টুপিটা নেই। তার বুদ্ধিও অনেকটা কমে গেছে।

২০ আষাঢ়, ১৩৩৮

দাদামশায়।

৩-৫-১৯৩০

পুপুমণি

বাবা লিখেছেন তোমাদের ওখানে বৃষ্টি মেঘ অন্ধকার। আমাদেব এখানে রোদ্দুর আছে অনেক—যদি লেফাফাই মুরে খানিকটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম তো বেশ হত।

বাবাকে বোলো কাল এখানে আমার ছবি দেখানো হল লোকে খুশি হয়েছে—সে অনেক কথা। লিখতে গেলে অনেকক্ষণ লাগবে। আঁদ্রে খুব বড় করে লিখবে বলেছে।

আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। সবাই জানতে পেরেচে আমি এখানে এসেচি। পালাতে যদি পারতুম তো খুশি হতুম। তোমার পুতুলের বাক্সর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখলে না কেন। তোমাদের ওখানে খ যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধহয় তোমার পুতুলের সর্দ্দি কাশি আরম্ভ হয়েছে—তাই এই রুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।

দাদামশায়

শান্তিনিকেতন

পুপুদিদি,

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি করে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তাছাড়া তোমার গাঙুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসদের মতই ভদ্র,—মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসদের চেয়ে এক হিসাবে ভালো—প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরি করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরি করে সেটা খেলে প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্চে—তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয় নি। তোমার বাবা ব্যস্ত আছেন প্রতিদিন

পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে—আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই।

ইতি
২২/১০/৩৫
'দাদামশায়।'

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের
গলি, কলিকাতা,

পুপুদিদি,

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ হারিয়ে গেল কোথা,
পথের ভুলে পেরিয়েছিল মরা নদীর সোঁতা।
কোন্ বুড়োমির পাঁচিলে তায় রাখল আড়াল করে,
জড়িয়ে তাকে দিল স্বপন - ঘোরে।
হঠাৎ তোমার জন্মদিনের আঘাত লাগ্‌ল দ্বারে
ডাক দিল সে কোন্ সেকালের ক্ষ্যাপা বালকটারে।
সেই যে ছেলে—আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে হঠাৎ গেল থামি।
বল্‌লে, শোনো, ওগো কিশোরিকা,
রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিতে যার লিখা
নামটা সত্য, সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর,
তাই বলে তো বয়সটা তার নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার জগৎটা তার কাঁচা
বাঁধেনি তায় বিষয়লোভের খাঁচা।
পায় যদি সে আশা
তোমার লীলার আঙ্গিনাতে বাঁধবে সে তার বাসা।
এই ভুবনের ভোর বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ,
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি করবে সুমধুর।

১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ 'দাদামশায়।'

'Uttarayan.'
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি,

বাসরে কী গরম। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘে ঢাকা, যেন কম্বলঢাকা রুগীর মত, আর হাঁপিয়ে ওঠে সমস্ত জগৎটা। পালিয়েছ খুব ভালো করেছ। ইতিপূর্বে কিছুদিন আগে প্রত্যহ ঝড়বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছিল—এমন কি, গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসেছিলুম। ভেবেছিলুম গরমের দিন ফুরোলো। গরম লুকিয়েছিল কোথায় আকাশের কোণে—লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পৃথিবীর উপরে। হঠাৎ একবার মেঘ জটলা করচে—আশা হচ্চে আর একবার জুড়িয়ে দেবে হাওয়া। কিন্তু বৃষ্টির দুতিন দিন পরেই আকাশের মেজাজ আরো বিগড়িয়ে যায়। আমাদের এই রকম অবস্থা।

দাদামশাই।

মংপু

পুপুদিদি

পাহাড়ের ডগায় ভালো হোটেলে বাস করচ, চারদিকে বন্ধুবান্ধবের দল, বেশ আছ ভালো। এখানে কোণে বসে বসে আমি তোমাদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই বেরিলি স্টেশনের ছবি মনে আসে আর হাত জোড় করে বলি ও মুলুকে আর নয়। এখানে এসে অবধি আমার শরীর ঠিক পূর্বের মতো নেই। কালিম্পঙে ছিলুম ভালো। কিন্তু সেখানে ঘর শূন্য—আমার সহায় কেউ নেই যে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটু অত্যুক্তি করচি—এখানে সেবা যত্নের অভাব নেই ঘর দুয়োরগুলোও ভালো—এখানকার নির্জনতাও প্রায়ই আমার মনকে খুব জড়িয়ে ধরে—একেবারে কবির উপযুক্ত। কিন্তু পাহাড়গুলো বড় বেঁটে—দারোয়ানদের মতো কেবল আকাশ আটক করে ধরে পাহারা দিচ্চে। আরো বেশ একটু রাজকীয় চালে মাথা তুলে দাঁড়াত যদি তাহলে গিরিরাজের মহিমা তুষারমুকুট পরে সামনে বিরাজ করত—আর তাই যদি না হোলো বেশ অনেকটা মাথা হেঁট করে ধরণী মাতাকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যদি তাঁর দিগন্তকে করত অবারিত তাহলে আমার সমতলবাসী মন খুশি হোত। জীবনে এমনি প্রচুর খুশি ভোগ করেছি অনেককাল, যখন ছিলেম শিলাইদহের চরে পদ্মার উদার নির্মল নির্জনতায়। সেই নির্বাক নিস্তব্ধতার বাহুবেষ্টনের জন্যে প্রায় মন কেমন করে। কিন্তু কী জানি এখন হয় তো মনেরই বদল হয়ে গেছে—সেই

শিলাইদহের সঙ্গে হয় তো আর খাপ খাবে না। এখন বাবু কেবলি changes his mind—কেবলি বাসা বদল করবার মেজাজ তার।—ছুটি ফুরোলে শান্তিনিকেতনে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব জানিনে, শ্যামলী না ধবলী না আর কোথাও। কিন্তু বৌমা হয় তো তখনো পাহাড়ে থাকবেন—তাঁর শরীরের পক্ষে হয় ত সেই ভালো। এমন অবস্থায় মনে করচি আমি পালাব গঙ্গাতীরে—ফালতায়।—খাবার এসেছে—তাগিদ চলচে।

ইতি
৭/৬/৩৯
'দাদামশাই,'

মংপু
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

পুপুদিদি,

তোমার চিঠি পড়ে খুব লোভ হচ্চে, বেশ আছ। আমার ভাগ্য ভালো নয়, মংপুতে এলুম, উন্নতি হোলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি একটু হোলো না, বরঞ্চ খারাপ। পালাতে ইচ্ছে করচে—কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পাহারা দিচ্চে নিচের ভূতলে, সাহস হচ্চে না। একটা খবর ভালো—এবার কার্বলিক এসিড লাগিয়ে কেন্নুই তাড়ানো গিয়েছে। কেদারা আঁকড়ে আছি, দেখচি মেঘ রৌদ্রের খেলা, কাজকর্মে মন নেই—মনে ভাবচি মোটের উপরে শান্তিনিকেতনটা জায়গা ভালো।

দাদামশাই।

পুপুদিদি,

তোমার তিনটে কুকুরের গলা শুনতে না পেয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে। শুনলেম তুমি আরো একটা সংগ্রহ করেচ—আরো পশু সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করো তাহলে শান্তিনিকেতনে মনুষ্য সংখ্যা কমাতে হবে জায়গা হবে কোথায়—তাছাড়া সকালে আমার রুটি তোসের গুঁড়োও পাওয়া যাবে না। এখানে জায়গাটা ভালো—কিন্তু তোমাকে যে নিমন্ত্রণ করব সে সাহস আমার নেই।

সোমবার
দাদামশায়।

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal.

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তুমি তো দৌড় দিলে বোম্বাই তারপর থেকে একদিনো আমার ছুটি নেই—একটা না একটা কাজের বন্ধন আমাকে বেঁধেছে। সামনে এখনো বাকী আছে অনেকগুলো, মহাত্মাজি এসেছিলেন, কাল চলে গেলেন। অতিথি প্রতিদিনই আসচেন—আজ প্রশান্তর সঙ্গে আসবেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী—কাল আমাকে যেতে হবে সিউড়ি, সেখানে মেলা উদঘাটন করা চাই—সমস্ত দিন যাবে এই কাজে। তারপরে এক সময় যেতে হবে বাঁকুড়ায়—নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে দুটো চারটে দিন রাত্রি যাবে কেটে। এই রকম চলে যাবে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত। তারপরে, খুব সম্ভব গরম পড়লে মংপুতে আমাকে টানবেন মৈত্রেয়ী। এখানে শীত চলচেই—ভালো লাগচে না—দিন রাত মোটা মোটা কাপড়ে বন্দী করে রেখেছে, বাইরে বসে বসন্তকাল ভোগ করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ওখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলে শুনে ভালো লাগল না। ওখানে তো বায়োকেমিক বড়ি জুটবে না—কুইনীন মিকশ্চার তোমার কপালে আছে।—মহাত্মাজিকে চণ্ডালিকা দেখানো হোলো, খুশি হয়েছেন। তারপরে এখন থেকে চলবে চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল। ভেবেছিলুম ডাকঘর করব কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত যে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। চণ্ডালিকায় মা সেজেছিল মমতা—খুব ভালো অভিনয় করেছিল। বুড়ি দিদির অভিনয়ের তো কথাই নেই। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ জেনো, অজিতকে জানিয়ো।

ইতি
২০/২/৪০
'দাদামশাই'

"Uttarayan,"
Santiniketan,
Bengal.
(May 1941.)

পুপুদিদি,

আঙুল যে চলে না কী করি বলো তুমি আছ পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর আমাদের

পোড়া কপাল কেবলি তেতে উঠচে—তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে মেঘ আসে জল আসে না। যদি আসে জল সে আসে চাষীদের চোখের কোণে।

ভাবতে কষ্ট লিখতেও কষ্ট অতএব এই পর্যন্ত।

আশীর্বাদ
দাদামশায়।

২০/১২/২৪

তিনবছরের বিরহিণী, জানলাখানি ধরে
কোন অলক্ষ্য পানে তুমি তাকাও অমন করে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি
ভাবী কালের প্রদোষ আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
...হয়ত সে এক সকাল বেলায় শিশির ধোওয়া পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে খোকার রথে
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে বৃহস্পতির দশায়
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে

দাদামশায়
বুয়েনাস্ আইরেস
অর্জেন্টিনা

আমার বাবা

আমার বাবা, দাদামশায়ের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়ীতে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে ইস্কুল তৈরী হয়েছিল সেখানেই বাবার প্রথম পড়াশুনা শুরু। বাবার কাছে শোনা—তাঁর আসল পড়াশুনা শিলাইদহে দাদামশায়ের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে তাঁর শরীর ছিল দুর্বল। তাই তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দাদামশায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন শিলাইদহে। সেখানে দাদামশায় তাঁকে খোলা মাঠে বা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে কখনো বাধা দিতেন না। তিনি অবাধে মাছ ধরতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, সাঁতার কাটতেন। তাতে তাঁর শরীরের যেমন উন্নতি হয়েছিল, লেখাপড়াও তেমনি থেমে থাকেনি। বাবা দাদামশায়ের কাছ থেকে যে সাঁতার শিখেছিলেন সে গল্প আমাদের প্রায়ই বলতেন। দাদামশায় নিজে খুব ভাল সাঁতার জানতেন, তাই বাবারও তাঁর কাছে সাঁতার শেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। বোট থেকে বাবা যাঁরা সাঁতার কাটতেন তাঁদের লক্ষ্য করতেন। নিজেও জলে নেমে এক আধটু যে চেষ্টা না করতেন তা নয়। কিন্তু কিছুতেই তাঁর সাঁতার শেখা হয়ে ওঠে না! একথা দাদামশায়কেও তিনি কয়েকবার বলেছেন। একদিন বাবা বোটে দাঁড়িয়ে আছেন—দাদামশায় ঠিক তাঁর পাশে। হঠাৎ বাবাকে তিনি বোট থেকে ঠেলে জলে ফেলে দিলেন। জলে পড়ে বাবা একেবারে হতভম্ব। কিন্তু ভেসে থাকতে পারছিলেন না বলে হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কেটে জল থেকে উঠে আসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন দাদামশায় নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে তুলে নিয়ে এলেন। সেই একদিনেই বাবার সাঁতার শেখা হয়ে গিয়েছিল।

খেলাধূলায়, বেড়ানোয়, সাঁতার কাটায় যত উৎসাহ, ঠিক পড়াশুনার দিকেও তাঁর তেমনি নজর ছিল। সংস্কৃত পড়ার জন্য শ্রীহট্টের টোলের পণ্ডিত শিরধন বিদ্যার্ণবকে ও ইংরেজি শেখবার জন্য মিস্টার লরেন্স নামক একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বাবার বয়স যখন বারো বৎসর তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় (১৯০১)। ঠিক সেই সময় কলকাতায় বাবার উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। উপনয়ন উপলক্ষে বেশ জাঁকজমক হয়েছিল। অনেক অতিথি অভ্যাগত এসেছিলেন। মহর্ষি বাবাকে উপনয়নের জন্য গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করতে নির্দেশ দিলেন। সংস্কৃত শিক্ষক শিবধন বিদ্যার্ণবের উপরও নির্দেশ হল বাবা যেন এই সংস্কৃত মন্ত্র ঠিকঠিক মত উচ্চারণ করতে পারেন। এই শুনে ছাত্র ও শিক্ষক দুজনেরই মাথায় বজ্রাঘাত হল। দিনরাত মন্ত্রোচ্চারণের পালা চলতে লাগল। কারণ অনুষ্ঠানের আগে মহর্ষি একবার পরীক্ষা নেবেন বলেছিলেন। তারপর একসময় মহর্ষির ডাক পড়ল। বাবা মহর্ষির সামনে দাঁড়াতেই বললেন, "বলো"। বিদ্যার্ণব ঠিক তাঁর পিছনেই চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবা এতটুকু ভুল না করে সব শুদ্ধ উচ্চারণে বলে গেলেন। সেই শুনে গুরুর আর আনন্দের সীমা ধরে না। মহা ধুমধাম করে বাবার উপনয়ন হয়ে গেল। অতিথিরা ফিরে গেলেন। উপনয়নের পরে বাবা শান্তিনিকেতনে চলে এলেন।

মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে যে ইস্কুল শুরু হয় তার মধ্যে বাবা একজন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের যে ছাত্রাবাস ছিল তা মাটির তৈরী এবং মাথায় টালির চাল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বাবাও ঐ ছাত্রাবাসে থাকতেন। খুবই সাধারণ খাবারদাবার দেওয়া হত। সকালে গুড় মুড়ি বা ছোলা গুড়। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বোর্ডিং-এ বাবার কষ্ট করে থাকা দিদিমা চাইতেন না। কিন্তু দাদামশায়ের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত বাবাকে বোর্ডিং-এই থাকতে হয়েছিল। সেই সময় আশ্রমে মাছ মাংস খাওয়া চলত না। সকলকেই নিরামিষ খেতে হত। নিজেরা পরিবেশন করে নিজেরাই এঁটো বাসন ধুয়ে নিত। বিদেশী রীতি অনুযায়ী রবিবার ছুটি না হয়ে বুধবার ছুটি পালিত হত এবং সকালে মন্দিরে উপাসনা হত।

বাবা বলতেন উপাসনার দিন দাদামশায় খুব ভোরে উঠে মন্দিরের বাইরে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় বসে থাকতেন। পুব আকাশে সূর্যের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতেন। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বাবাও স্নান সেরে ধুতি চাদর পরে উপাসনায় যেতেন।

সেদিন আশ্রমের কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। কিন্তু সেই আশ্রম জীবনের

মধ্যে ছিল অনাবিল আনন্দ। বাবা বলতেন, শিক্ষা কেবল পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে হয় না। মনকে সরস করে জাগিয়ে তোলে যে শিক্ষা তাই হল আসল শিক্ষা। দাদামশায়ের প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয়ের মধ্যেই বাবা বড় হয়েছেন। তারপর বাবা কলকাতায় এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন।

১৯০৫ সালে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলন একদিন সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ঢেউ একদিন শান্তিনিকেতনেও এসে পৌঁছেছিল। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী তখন দাদামশায়ের কাছ থেকে স্বদেশী গান শিখে চারিপাশের মানুষদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাতে শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে তা পরিবেশন করতেন। আমার বাবা তাঁদের কাছ থেকে সেই সব গান শিখে নিয়েছিলেন ও গানের দলে থাকতেন। সঙ্গে থাকতো তাঁদের ভিক্ষার ঝুলি।

বাবা ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্য টাকা তুলতে কলকাতায় স্বদেশী গানের দলের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে চাঁদা তুলেছেন। তা ছাড়াও অনুশীলন সমিতিতেও তাঁর যাওয়া আসা ছিল। বাবা শান্তিনিকেতনে এক জুজুৎসু শিক্ষকের কাছে জুজুৎসু শিখেছিলেন। সেই শিক্ষা তাঁর কাজে লেগেছিল। তিনি অনুশীলন সমিতিতে জুজুৎসু শেখাতেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু ১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য বাবাকে আমেরিকা যেতে হয়। সঙ্গী তার সহপাঠী সন্তোষ মজুমদার। ১৯০৯ সালের শেষ দিকে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলেন বাবা। তখন দাদামশায়ের নির্দেশ হল বাবা যেন জমিদারী তত্ত্বাবধান করার ফাঁকে কৃষিবিদ্যা নিয়ে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

বাবার শিলাইদহে নূতন করে জীবনের শুরুতেই ক্ষেত খামার তৈরী হল। এ-সময় বিদেশ থেকে ভুট্টোর বীজ ও অন্যান্য বীজ আনানো হয়। এ দেশের উপযোগী কৃষির জন্য নানা যন্ত্রপাতি তৈরী করা হল, কাজ চলতে লাগল জোর কদমে।

বাবা বিবাহের পরে কয়েক বছর শিলাইদহে ও কলকাতায় কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন। এদিকে দাদামশায়ের পক্ষে শান্তিনিকেতন পরিচালনা করা রীতিমত ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল। বাবাকে তিনি তাই শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠালেন ১৯১৮ সালে। সেই তখন থেকেই বাবা শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব নেন।

দাদামশায় থাকতেন তাঁর লেখাপড়ার কাজ নিয়ে। বাবা শান্তিনিকেতনের বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশুনো করতেন। তিনি নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সরিয়ে

রেখে শান্তিনিকেতনে দাদামশায়ের নতুন নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। শান্তিনিকেতনের তখন নানা সমস্যা। আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানারকম আইনগত ব্যবস্থার জন্য সব সময় বাবাকে চিন্তিত থাকতে হত। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য ছিল যথেষ্ট। বস্তুত, আজকের সাজানো, গোছানো, গাছ-গাছালিতে ঢাকা সুন্দর শান্তিনিকেতন আমার বাবারই হাতে গড়া।

নিজের কোন কাজ বা নিজের কোন কিছু নিয়ে বাবাকে কখনো কিছু বলতে কেউ শোনেননি। দাদামশায়ের কাজই যেন ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কর্তব্য। বাবা, দাদামশায়কে সুখী করার জন্য চিরকাল আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দাদামশায়ের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভাল লাগা, না লাগা, সুখ দুঃখ বেদনা, আমার বাবা যতটা বুঝতে পারতেন এমন আর কেউ পারতেন না। শমীকাকা মারা যাবার পর দাদামশায়ের মনের যে কি নিদারুণ অবস্থা হয়েছিল তা একমাত্র বাবাই বুঝতে পেরেছিলেন। বাবা তখন সে কথা অনেককে বলেছেন। দাদামশায়ের মনে কোন সুখ ছিল না। বাবা দাদামশায়কে একটু নিশ্চিন্ত রাখবার আশায় সদাসর্বদা তাঁর কাজেই নিয়োজিত থাকতেন। দাদামশায়ের ইচ্ছাতেই বাবা শান্তিনিকেতনের কর্মভার নিজের হাতে তুলে নেন। শান্তিনিকেতনের ভার নেবার পর, শান্তিনিকেতন সম্পর্কে কোন রকম দুর্ভাবনা করা থেকে দাদামশায়কে বিরত রাখতে তিনি চেষ্টা করেছেন। দাদামশায়ের ইচ্ছায় শ্রীনিকেতনকে গড়ে তোলা, উত্তরায়ণের নতুন নতুন রূপ তিনি দিয়েছেন। ফুল ভালবাসতেন বলে দাদামশায়ের ইচ্ছানুযায়ী উত্তরায়ণের উদ্যান বাবা নিজে তৈরী করেছেন। শুধু তৈরী নয়, দাদামশায়ের লেখার পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ইত্যাদি সংরক্ষণের দিকে তিনিই প্রথমমনোযোগদিয়েছিলেন। নানাজনের কাছে ছড়িয়ে থাকা দাদামশায়ের চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে তাঁকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। তারপর একটা বিশেষ সময় থেকে তিনি দাদামশায়ের চিঠিপত্রও কপি করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বাবার নির্দেশে দাদামশায়ের লেখা পাণ্ডুলিপি কপি হয়ে তবে প্রেসে যেত। তা ছাড়া দাদামশায় সম্পর্কে যেখানে যা কিছু প্রকাশিত হোত তা সংগ্রহ করে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা বাবা করেছিলেন। পরে ১৯৪২ সালে আমার বাবাব অদম্য উৎসাহ, পরিশ্রম ও অপরিমেয় ত্যাগের ফলে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রভবন। তখন রবীন্দ্রভবনের জন্য কোন জায়গা ছিল না। তাই উদয়নের একতলায় রবীন্দ্রভবনের কাজ চলত। পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে তা "বিচিত্রা" বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

বাবার নিরলস পরিশ্রমে শান্তিনিকেতন সুন্দর ও শ্রীময় হয়ে ওঠে। তাঁর কৃষি বিষয়ে জ্ঞান এ কাজে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বাবার নির্দেশে তখন উত্তরায়ণ, ছাতিমতলা ও বাগান তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। বাবা বলতেন এ ব্যাপারে দাদামশায় সব সময় তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন।

দাদামশায় প্রথম ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরায়ণের একটি পর্ণকুটীরে বাস করার জন্যে উঠে আসেন। তখন উত্তরায়ণ ধূ ধূ প্রান্তর। ঐ সময় হতেই বাবার মনে বাড়ীর পরিকল্পনা ছিল। উত্তরায়ণ কি ভাবে তৈরী হবে তা নিয়ে তিনি দাদামশায়ের সঙ্গে বহুবার আলাপ আলোচনা করেছেন।

আজকের উত্তরায়ণের বাড়ীগুলি হল আমার বাবার চিন্তা, পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতার ফসল। তিনি সব সময় এ ব্যাপারে নন্দলাল বসু ও সুরেন করের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বাবা এ ব্যাপারে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে পশ্চিমী ও প্রাচ্য স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে উত্তরায়ণের বাড়ীগুলি।

প্রথমে তৈরী হয় কোনার্ক, এরপরে একে একে তৈরী হয় উদয়ন, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচী। আর বাড়ীগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী হয় বাগান।

বাবা নিজে শিল্পী ছিলেন। সুরেন কর মশায়ের সঙ্গে বসে পরামর্শক্রমে উদয়নের ডিজাইন তৈরী করেছিলেন।

বাবা এর মধ্যে বিলাসিতা বা লোক-দেখানো বাবুয়ানীকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি চেয়েছিলেন সূক্ষ্ম শিল্পময় রুচির বিকাশ ঘটাতে। কারণ উদয়নের ঘরে কোন দামী উপকরণ ছিল না। দেওয়ালে ছিল সৌন্দর্যময়তার প্রকাশ। উদয়ন পূর্বমুখী তিনতলা, —প্রায় আট বছর ধরে ধীরে ধীরে বাবার তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠেছে।

উদয়ন ঢোকার মুখেই ঢাকা বারান্দা দেখলে নাটকের মঞ্চের মতো মনে হয়। চীনদেশের স্থাপত্যের অনুকরণে এটি তৈরী। দুপাশে খোলা বারান্দা। স্তম্ভগুলি অজন্তা ইলোরায় গড়ে ওঠা বৌদ্ধ স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। দক্ষিণের ঘরগুলির গঠনশৈলীতে জাপানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কবি বুদ্ধদেব বসু একবার বাবার সঙ্গে উদয়নের ঘরগুলো ঘুরে দেখে বাবাকে বলেছিলেন, উদয়নে সবচেয়ে ভাল পুপে দিদির ঘরগুলো। তিনি তাঁর "সব পেয়েছির দেশে" উদয়ন সম্বন্ধে লিখেছেন,—'নানা কোণ, মোড় ও উঁচু নীচুর ভেতর দিয়ে ছন্দের অক্ষুণ্ণ সুষমা বাইরে যেমন প্রকাশিত ; ভেতরেও তেমনি

অনুভূতি আনে।' আসবাবপত্রগুলি সম্বন্ধেও তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই আসবাবপত্রগুলির বিশেষত্ব প্রথম দর্শনেই চোখে ঠেকে এবং এখানে তুচ্ছ-জ্ঞান কোন প্রয়োজনের জিনিস দেখলাম না যা সুন্দর নয়।'

এইসব আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, খাট, পর্দা সব আমার বাবার তত্ত্বাবধানে তৈরী। শুধু তত্ত্বাবধানেই তৈরী নয়, অনেক জায়গায় তিনি নিজেও হাত লাগিয়েছেন।

বাবা খুব ভাল কাঠের কাজ করতে পারতেন। কাঠের উপর শিল্পকর্ম করতেও বাবার জুড়ি ছিল না। শুধু উত্তরায়ণের আসবাবপত্র নয়, রতনকুঠী-র অনেক আসবাবপত্রও বাবার নিজের হাতে কিংবা তাঁর নির্দেশে তৈরী।

এই সমস্ত জিনিস তৈরিতে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যময়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অলঙ্করণের বাহুল্য তিনি বর্জন করেছেন। এখানেও যেন এদেশীয় রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোথায় একটা মিল আছে তাঁর সেই শিল্পকর্মের মধ্যে ভারতীয় রুচিবোধ ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বিলাতী কিছু রীতির মিলন ঘটেছে।

উদয়নের বাগানের একদিকে মায়ের জন্য স্টুডিও তৈরী করে দিয়েছিলেন বাবা। এই স্টুডিওটির নাম দেওয়া হয়েছিল চিত্রভানু। নীচে বাগান ছিল—তাই বাগান নষ্ট না করে পিলারের উপর দোতলায় গড়ে উঠেছিল চিত্রভানু। জাপানের বাগানের সঙ্গে যেভাবে বিশ্রামগৃহ তৈরী হয় অনেকটা সেই রীতিকে অনুসরণ করেই তৈরী। নীচের থেকে বৈচিত্র্যময় পাতাবাহার ও ফুলে ঢাকা সিঁড়ি চিত্রভানুর বারান্দায় উঠে এসেছে। খোলা বারান্দায় বসে দাদামশায় অনেক সময় কবিতা লিখতেন। চিত্রভানুর পূর্বে ও উত্তরে আলো কোথাও বাধা পায় না। ঘরের মধ্যে কাঠের তাক দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। টেবিলের মধ্যে চা ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার এবং বসার জায়গার সঙ্গে নীচে Box System এমন ভাবে বাবা তৈরী করেছিলেন যেখানে অনায়াসে বসাও হত আবার ব্যবহৃত জিনিসপত্রও রাখা হত। সমস্ত আসবাবপত্র এমন কি চেয়ার, টেবিল পর্যন্ত এত সুন্দরভাবে রাখা যে, তা ঘরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে তাকালে পুরো বাগানটাও চোখে পড়ে। বাবা সব সময় বলতেন খুব কম জায়গার মধ্যে এমনভাবে জিনিসপত্রগুলিকে তৈরী করতে হবে যে থাকার ও জিনিসপত্র রাখার যেন কোন অসুবিধা না হয়। এই চিত্রভানুটিও ঠিক সেই ভাবে তৈরী করা হয়।

চিত্রভানুর একতলায় বাবার নিজের ওয়ার্কশপ—গুহাঘর। এই গুহাঘরটি চিত্রভানুর অনেক আগেই তৈরী করেছিলেন বাবা। এর সমস্ত কিছুই তাঁর নিজের

পরিকল্পনা মত গড়ে উঠেছিল। ঘরটি এত নীচু ও ছোট হঠাৎ বাইরে থেকে দেখলে গুহাই মনে হয়। বাইরের দেওয়ালে লতাপাতা জড়ানো, পাথর বসানো, তাতে গুহার সঙ্গে অনেকটা মিল চোখে পড়ে। আসলে শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে এটি তৈরী। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় শান্তিনিকেতনের দুপুরে আগুনের যেন হলকা ছোটে। কিন্তু গুহাঘরের নির্জন শান্ত পরিবেশ এই অসহ্য দুপুরটাকে কোন ক্রমেই বুঝতে দেয় না। ঘরটিতে সব কিছু এত সুন্দরভাবে সাজানো তা শুধু ঘরের সজ্জাই না দেখলে তার থেকে অনেক কিছু বেশী মনে হয়।

বাবা যখন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হিসাবে কার্যভার নেন তখন এই ঘরটিতেই সামনে রাখা ছোট চেয়ার টেবিলটিতে বসে কাজ করতেন। সিমেন্টের বেদীর উপর বড় খাট তাতে বিশ্রাম নেওয়া ও কাজ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। শীতল পাটী দিয়ে দেওয়ালগুলো ঢাকা। খাটের উত্তর দিকে কাঠের শেল্‌ফ। প্রয়োজনীয় সব কিছুই যাতে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় এইভাবে তৈরী। শুয়ে শুয়ে বই পড়ার জন্য ছোট ল্যাম্প। এমনভাবে ল্যাম্পটি লাগানো যে চট করে চোখে পড়ে না। মাথার উপর ছোট্ট একটি পাখা। খাটের দক্ষিণ দিকে পিতলের খুব সূক্ষ্ম জাল। সেই জাল এমন ভাবে বসানো যাতে ওঠানো বা নামানো যায়। তার মধ্যে আবার খোপ তৈরী। সেখানেও ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখতেন। বিশেষ করে সেন্ট তৈরী করার জিনিসপত্র রাখা হত। মশামাছি আটকানোর জন্য এক অভিনব মশারী তৈরী করেছিলেন বাবা। একটি আছে সূতীর জাল যা দু দিক থেকে টানা যায়। আর টানলেই মশারী তৈরী। কাঠের কাজ করার জন্য দক্ষিণ দিকে টেবিল। টেবিলের সঙ্গে সামনের দেওয়ালে যন্ত্রপাতি রাখবার নানারকম ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে ড্রয়ারে কাজের জিনিসপত্র—যেমন মেটালের পাত, স্ক্রু ও বিভিন্ন রকমের কাচের যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। দুটি Pillar-কে ঘিরে যন্ত্রপাতি রাখার কাঠের খোপে সুন্দর ব্যবস্থা। দক্ষিণ দিকে ঘরে বসে বাবা যেখানে কাঠের কাজ করতেন সেখানে কাজের শেষে কাঠের তৈরী একটি জিনিসের মধ্যে হাত ধোয়ার সুব্যবস্থা। তার মধ্যে Calling bell system. প্রয়োজনে যাতে কাউকে ডাকা যায়। উত্তরায়ণের প্রত্যেকটি স্তরের কত ফুট অন্তর কি মাটি পাওয়া গিয়েছিল তাও সযত্নে রেখেছেন। যাতে ভবিষ্যতে উত্তরায়ণের কাজে অনেকটা সহায়তা করতে পারবে। বাথরুমের দেওয়ালে কাঠের তৈরী কাপড়জামা রাখার আলমারি ও কাগজপত্র রাখার সুন্দর ব্যবস্থা সবই বাবা নিজে হাতে তৈরী করেছিলেন। বাবা

মাঝে মাঝে লাঠি ব্যবহার করতেন। সে সব লাঠি ছিল বিচিত্র ধরনের। গাছের ডাল কেটে তৈরী করেছিলেন। এইসব বিচিত্র ধরনের লাঠি সংগ্রহ করা ছিল তাঁর এক ধরনের সখ। এছাড়া বিভিন্ন দেশের কাঠ যোগাড় করে রেখে দিতেন এবং তার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

উত্তারযনেব মধ্যে 'শ্যামলী' দাদামশায়ের ইচ্ছার সঙ্গে বাবার কর্মতৎপরতার ফলেই গড়ে উঠে। তখন শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠনের কাজ পুরোদমে চলছে। দাদামশায়ের তখন সখ হয়েছিল মাটির বাড়ীতে বাস করা। বাবার কাছে তাঁর অভিলাষটি প্রকাশ করেছিলেন। মাটির বাড়ী অর্থাৎ মাটির দেওয়াল বীরভূমের সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন বাড়ীর ছাদটিও হবে মাটির তৈরী, এটি বড় সহজ কাজ নয়। বাবা তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। এরপর বাবা তাঁর সহকারী সুরেন কর এবং নন্দলাল বসুর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রথম ডিজাইন বাবা নিজেই তৈরী করেন এবং দাদামশায়কে দেখালেন। দাদামশায়ের মতামত নিয়ে আবার বসলেন সুরেন কর ও নন্দলাল বসুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বাবার ডিজাইনের সংস্কার করে নূতন ডিজাইন তৈরী করলেন সুরেন কর। নন্দলাল বসু তাতে বোরোবুদুর ও নালন্দার ডিজাইন খোঁজ করলেন। সমস্ত বাড়ীটাই মাটি দিয়ে তৈরী। মাটিকে গোবর ও আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা হয়। তখন শান্তিনিকেতনের আশপাশে বেনা বা শর গাছ প্রচুর পরিমাণে হত। টুকরো টুকরো করে সেগুলিকে মাটির সঙ্গে মেশালেন যাতে মাটির আঁট ভাল হয়। তারপর সেই মাটি দিয়ে তৈরী হল শ্যামলী। মাটির ছাদের সেই বাড়ী দেখতে তখন গ্রাম থেকে তিলেতিলে লোক আসতেন। দাদামশায় তখন শ্যামলীতে বাস করতে লাগলেন। তারপর যে বছর প্রচণ্ড বর্ষা শুরু হয়, ঠিক সেই বছরে শ্যামলীর মাটির ছাদে ফাটল দেখা দিল। দাদামশায় তখন বিরক্ত হয়ে বাবাকে বললেন,—আমার জন্য এর পাশে একটা ঘর তৈরী করে দাও। যার চারিদিকে খোলা বারান্দা থাকবে।

দাদামশায়ের ইচ্ছানুযায়ী বাবা শ্যামলীর কয়েক হাত দূরে মাটির দেওয়ালের উপর কংক্রীটের ছাদ তুলে একটি বাড়ী তৈরী করালেন। দাদামশায় তার নাম দিয়েছিলেন 'পুনশ্চ'। পরে দাদামশায়ের ইচ্ছায় বাবা তার নানাভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন রূপ দিলেন।

পুনশ্চতে দাদামশায় বছর দুই কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন। তখন বাবাকে ডেকে বললেন—এবার আমার একটি ছোট্ট বাড়ী তৈরী করে দাও। দোতলা,—যার উপরে একখানি ঘর থাকবে, ...চারিদিক খোলা।

দাদামশায়ের কথামত বাবা পুনশ্চর দক্ষিণ পূর্বে চারটে থামের উপর ঘর করেছিলেন। এটির নাম উদীচি। উত্তরায়নের বাড়ীগুলি এভাবে পরপর তৈরী হয়েছে। দাদামশায়ের মনের মত সব কিছু গড়ে তুলতে বাবা শান্তিনিকেতনে সুরেন কর, নন্দলাল বসু ছাড়াও আরও বিভিন্ন মানুষের সাহায্য নিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। এবং যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁদের কথা বারবার অকুণ্ঠ চিত্তে বলেছেন। কিন্তু বাবা নিজে উত্তরায়নের নির্মাণ কাজে কতখানি ছিলেন সে-কথা কখনও বলেননি। আজ আমরাও তাঁর নামটি উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি। উত্তরায়নের বাড়ী ও বাগানের পরিকল্পনা ছিল আমার বাবার। মা তাঁকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। বাগান কি ভাবে হবে, এবং কোন বাড়ীর পাশে কোন গাছের চারা লাগালে বাড়ীর সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলবে তা তিনি ঠিক করতেন। কোন গাছ বাড়লে, বাড়ীর ক্ষতি হবে এ নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতে দেখেছি। কোনার্কের গায়ে শিমুল গাছ নিয়ে বাবার দারুণ দুশ্চিন্তা ছিল। তিনি বারবার বলতেন, শিমুল পলকা গাছ, —ঝড়ে ভেঙে গেলে কোনার্কের বারান্দার ক্ষতি হবে। কিন্তু তা কাটতে দাদামশায়ের আপত্তি ছিল।

বাবা দেশ-বিদেশে যেখানে গেছেন, সেখানকার উদ্যান তিনি ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন। উত্তরায়নের বাগান তাঁর বিভিন্ন দেশের নানা উদ্যানের সম্মিলিত রূপ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল ইংল্যান্ডের বাগানের। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে নষ্ট না করে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশের সঙ্গে তিনি গাছপালা লাগিয়েছেন। এর উপর জাপানের উদ্যান রচনা ও তাদের শিল্পকৌশলও ব্যবহার করেছেন। সর্বত্র আমরা যে সব দেখি—তার তুলনায় উত্তরায়নের বাগান সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ যেন প্রকৃতির নিজের স্বভাবে গড়ে উঠেছে। সর্ব ঋতুর নানা রঙের সম্ভার নিয়ে এর আত্মপ্রকাশ। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন রকম ফুল ও গাছের এক অসাধারণ মিলন ঘটেছে এখানে। এই বাগান রচনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমার বাবা। তাঁর দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এই বাগান গড়ে উঠেছে। এ শুধু রুটিনমাফিক কাজ বা বাগানের যত্ন করা নয়, —বাবার কাজ দেখে মনে হতো যেন শিল্পী তাঁর বাগানের ক্যানভাসে ফুলের নক্‌শা রচনা করছেন।

উত্তরায়নের বাগানে ঢোকার মুখেই সারি সারি দেবদারু, আর ইউক্যালিপটাস গাছ। উদয়ন বাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে নারকেল গাছ। কুরচি, মুচকুন্দ ও হিমঝুরির সারি ঠিক সামনে। গোলাপ বাগানের দিকে শিরীষ আর শিশুগাছের সারি। উদয়নের সামনে কাঁকর বিছানো মাটি পার হয়েই গোলাপ বাগান। এই গোলাপ

বাগানটি বাবা যে কি যত্নের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন না। শান্তিনিকেতনের কাঁকুরে মাটিতে গোলাপ ফুল ফোটানো তখন সম্ভব ছিল না। অথচ দাদামশায়ের গোলাপের প্রতি যথেষ্ট প্রীতি ছিল। একথা বাবা জানতেন। সেইজন্য উদয়নেব সামনে গভীর গর্ত করে গঙ্গামাটি আনিয়ে ভরেছিলেন। প্রচুর গঙ্গামাটিও তাতে লেগেছিল। এছাড়াও বড় গাছের শিকড় ও উইপোকা থেকে গোলাপ বাগানকে রক্ষা করার জন্য সেই গর্তের চারিপাশে করোগেটের টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এরপর মাটি তৈরী হলে সেখানে কয়েকশ গোলাপের চারা লাগিয়ে ছিলেন। এই বাগান করার জন্য তাঁকে প্রচুর অর্থব্যয়ও করতে হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত খরচ কমিয়ে তাঁর থেকে বাগানের জন্য খরচ করতেন। দাদামশায়কে এই বাগানের খরচের কথা কখনও জানাননি। পরে যখন গোলাপ ফুল ফুটেছিল—তখন বাবা সবার আগে দাদামশায়কে বাগান দেখিয়েছিলেন। সে সময় দাদামশায় মন্তব্য করেছিলেন—রথী আমি জীবনে কখনই ভাবতে পারিনি এখানে গোলাপ ফুল দেখব। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছ।

উদীচীর ঢোকার মুখে যুঁই, মালতী, মধুমালতীর ছায়া, দু'পাশে রং-বেরংয়ের বাগান। কোনার্কের গায়ে নীলমণিলতা। যা পিয়ার্সন সাহেব এনেছিলেন। বাবা ঠিক ঠিক জায়গায় সেই সব গাছ লাগিয়েছিলেন।

উদয়ন যাবার মুখে বাঁ দিকে লতাবিতান। যেখানে লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে পেয়ারা গাছগুলো একাত্ম হয়ে কেমন লতানো হয়ে আছে। বাবা এখানে আম, লিচু, পেয়ারা, জামরুল, সফেদা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখাকে লতানো গাছে পরিবর্তিত করেছিলেন। এ নিয়ে বাবা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

এছাড়া উদয়নের নিষ্ফলা আমগাছের ডালপালা কেটে দিয়ে তাতে নূতন ডালপালা জুড়ে তাকে ফলবতী করে তুলেছিলেন। এসব কাজে তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলেন। এছাড়া এই অনুর্বর ভূমিতে তিনি হিং, কর্পূর, এলাচের চাষ করেছিলেন। তিনি বলতেন চেষ্টা করলে এই মাটিতে অনায়াসে সব চাষই হতে পারে। এই মাটিতে আনারসের চাষ করে প্রমাণ করেছিলেন তাপ ও আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এই রুক্ষ মাটিতে আনারসের চাষও সম্ভব। তখন তাঁর সেই উত্তরায়ণের গোলাপ বাগান ও ফুল ফলের গাছ দেখে মনেই হতো না শান্তিনিকেতনের মাটি অনুর্বর।

উদয়নের পিছনের বাগানটি বাবা জাপানি বাগানের মডেলে তৈরী

করেছিলেন। বাগানে কৃত্রিম লেক, ফুলের গাছ, টব, সব কিছু মিলিয়ে জাপানি সৌন্দর্যের যেন আভাস পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাবা রঙীন সিরামিকসের টুকরো দিয়ে তৈরী টবে ক্যাকটাস ও নানারকম পাতাবাহারের গাছ এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে তা এক অসাধারণ দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল।

গুহাঘর পার হয়েই দ্বীপের উপর কৃত্রিম হ্রদ পম্পা। জলের উপর দিয়ে যাবার বাঁধানো রাস্তা। জলের উপর নুইয়ে পড়া গাছ। চারিপাশে মরশুমী ফুলের গাছ। সেখানে দেশ-বিদেশের ফুল, নানা জাতের ঝাউ। দেশী বিদেশী লতাগাছ—অপরাজিতা, মাধবী, মালতীর সঙ্গে। এ্যালামাণ্ডা ও ক্লোরেভেন। নানা জাতের বেগনভিলিয়া ও পাতাবাহার।

সারা বছর যাতে বাগান সাজানো থাকে তার জন্য বাবা সব ঋতুর সকল রকমের মরশুমী ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। সর্বসময়ই বাগান যেন বর্ণে বৈচিত্র্যে ঝলমল করত। বাবার এই উদ্যানচর্চার বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে বিজ্ঞানী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন....

'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং নূতন নূতন ফলমূল শাকসব্জি উৎপাদনে উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টার অগণিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষিপ্রধান হইলেও আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দুই একটি উদ্ভিদের কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকিলেও ব্যাপকভাবে কৃষিকার্যে অথবা উদ্ভিদ উৎপাদনে তেমন কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই বিষয়ে শান্তিনিকেতনে যে সকল কাজ হইতেছে তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা ও তৎসম্পর্কিত অসাধারণ কর্মদক্ষতা লইয়া বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতার উৎকর্ষ সাধন এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রধানত পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক স্থলে সাফল্য লাভ হইয়াছে। টমেটো, গম প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফসল যাহা শান্তিনিকেতনের চতুর্পার্শ্বস্থ অনুর্বর ভূমিতে কোন কালেও জন্মাতে দেখা যাইত না, সেইগুলিকেও তিনি সফলতার সহিত জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুদৃঢ় কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা সমন্বিত আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছগুলিকে তিনি দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া লতাগাছে পরিবর্তিত করিয়াছেন। তাহার ফলে দেওয়ালের শোভা বর্ধন, বেড়ার প্রয়োজন এবং তৎসহ ফলোৎপাদন—এই কয়েক প্রকার কাজই সম্পাদিত হইতেছে। স্থানীয় জমির ক্ষয় এবং অনুন্নত

অসমতা নিবারণকল্পে তিনি অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত যেরূপ কৌশল সহকারে দেশী-বিদেশী বিবিধ উদ্ভিদের সহায়তা লইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অনুধাবনযোগ্য। মাটির আঁট বাঁধিবার জন্য একপ্রকার সুগন্ধি ঘাস আমদানি করিয়াছেন, এগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্টভাবে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে যে, মনে হয় একদিকে যেমন ইহারা জমির ক্ষয় নিবারণ এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইবে অপর দিকে তেমনই অদূর ভবিষ্যতে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। পরিত্যক্ত পুরাতন আম্রকুঞ্জের নিষ্ফলা গাছের গুঁড়ির সহিত নূতন ডালপালার জোড় মিলাইয়া পুনরায় সেগুলিকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাছাড়া এরূপ অনুর্বর ভূমি খণ্ডে কর্পূর, হিং, এলাচ প্রভৃতি নানারকমের গাছ জন্মাইয়াছেন। তাহাদের সতেজ পত্রপল্লব, আয়তন এবং বৃদ্ধির হার দেখিলে মনে হয়, অচিরেই ইহারা দেশের সর্বত্র বংশবিস্তারে সাফল্য লাভ করিবে। আলোক ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া তিনি ঐ স্থানে আনারস উৎপাদনেও কৃতকার্য হইয়াছেন। তাঁহার গোলাপ বাগানের ফুল, ফল, লতাপাতার অবস্থা দেখিলে ঐ স্থানের মৃত্তিকার অনুর্বরতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা স্বাভাবিক নয়। বিশ্বভারতীর বহুমুখী বিরাট কর্মক্ষেত্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া এবং অবসর মত যন্ত্রবিজ্ঞান ও ললিতকলার অনুশীলনে সময় ক্ষেপ করিয়াও তিনি যে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়াই মনে হয়।'

বাবা শিল্পপ্রতিভা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। বংশে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দাদামশায় রবীন্দ্রনাথ সকলেই ছিলেন শিল্পী। বাবা আজন্ম এই আবহাওয়ায় মানুষ। শিল্প ছিল তাঁর রক্তে। ছোট থেকেই নিভৃতে বাবা শিল্পের চর্চা করেছেন। তাই পরে স্বয়ং দাদামশায়ের কাছে বাবা শিল্পে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবু অন্য সব কিছুর মত নিজেকে শিল্পী বলতে যেন তাঁর কুণ্ঠা ছিল। তাঁর নিজের আঁকা সব ছবিতে তিনি নিজের নাম সই পর্যন্ত করেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, জন্মেছি শিল্পীর বংশে কিন্তু করছি মুচি ও ছুতোরের কাজ। আসলে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ভাবতে তাঁর জুড়ি ছিল না। অথচ পরবর্তী কালে বিভিন্ন চিত্রসমালোচকরা তাঁর আঁকা ছবি, কাঠ ও চামড়ার কাজের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম তাঁর নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছে। অন্য কোন শিল্পীর শিল্পকর্মের প্রভাব তাঁর ছবিতে নেই বললেই হয়।

বাবার শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে স্টেলা ক্র্যামরিশ বলেছেন, "Rathindranath

Tagore is a maker of form. To the art of India of today he gives back the dignity of its craft out of the store house of his mind he shapes the order of things and their fitness. He carves objects from many woods and paints the portraits of many flowers. His work does not belong to any school. Self-tought and straight forward it follows the discipline of first principles and applies there with tenderness of precesion to small objects and pictures.

বাবা অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। তার মধ্যে ফুলের ছবি ও ল্যান্ডস্কেপই বেশী। ফুলের ছবি আঁকায় তাঁর তুলনা পাওয়া ভার। ফুলের ছবি এঁকে তাতে এত সুন্দর রঙ দিতেন যে দেখে মনে হত সত্যিকার ফুল ফুটে আছে। একথা মীরা পিসি বারবার বলতেন। দাদামশায়ও বলতেন, 'ওর ফুলের ছবিগুলো সত্যি ভালো, এত delicate করে আঁকে। ফুলের ছবিতেই ওর বিশেষত্ব।'

কিন্তু বাবা ফুলের ছবি ছাড়াও গ্রোটেস্ক (Grotesque) ডেকোরেটিভ ডিজাইন, মাস্ক, ট্রি এ্যান্ড ফ্লাওয়ার স্টাডিজ ও অসংখ্য স্কেচ করেছেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম বাবা হয় ছবি আঁকছেন, কিংবা কাঠের উপর ইনলের (খোদাইয়ের) কাজ করছেন। নিজের ঘরটিতে বসে এত নিবিষ্টভাবে বাবা কাজ করতেন যে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু যেন তিনি ভুলে যেতেন। বাবা বলতেন এই শিল্পকর্মেই তাঁর গভীর আনন্দ।

বাবা ছবিতে ওয়াটার কালার ব্যবহার করতেন। তবে কখনো কখনো তাঁকে প্যাস্টেল কালারও ব্যবহার করতে দেখা যেত। বাবার ছবিতে চমৎকার রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়। কখনো তিনি উজ্জ্বল রঙ গাঢ় করে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ল্যান্ডস্কেপ ও ফুলের ছবিতে বিশু বাদের (Pointative) প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করলেও তা সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে বলা যায় না। বিশেষ করে ফুলের ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর স্বকীয়তা ছিল। ফুলকে তিনি দেখেছেন যত কাছ থেকে ও যত সুন্দরভাবে, তেমনি করে তিনি তাঁর তুলিতে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। এত রিয়ালিস্টিক ছবি খুব কমই দেখা যায়।

বাবা আবার শুধু ফুলের স্কেচই করেছেন, কখনো তিনি সব খুঁটিনাটিসহ ফুলের সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছেন। এতে detail এর কাজ পাওয়া যেত। কত অসংখ্য ফুলের যে তিনি ছবি এঁকেছেন তার হিসাব নেই। দেশী-বিদেশী সব ফুলের ছবিই তিনি এঁকেছেন। বাবার আঁকা গোলাপ ফুলের ছবি হয়তো অনেকে দেখেছেন। জলরঙে আঁকা ছবিটি কি জীবন্ত। দেখে মনে হয় যেন সত্যিকার ফুল। বাবার 'পিতৃস্মৃতি' বইয়ের প্রচ্ছদে সেই গোলাপফুলের ছবিটি ব্যবহার করা

হয়েছে। গোলাপ ছাড়াও বাবা লিলি, কাঞ্চন, কলাবতী, কক্কে, পলাশ, ডালিয়া, জিনিয়া, বুনোফুল, হলিহক, ঘণ্টাফুল, ম্যাগনোলিয়া, প্যাশম ফ্লাওয়ার, ক্যাকটাস প্রভৃতি ফুলের ছবি এঁকেছেন।

শুধু ফুলের ছবি নয়, বিভিন্ন গাছ ও ল্যান্ডস্কেপও এঁকেছেন বাবা। বাবা পাহাড় বন ভালবাসতেন। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে তিনি পাহাড়ের ছবি আঁকতেন। তাঁর পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে কালিম্পং পাহাড়, আলমোড়া পাহাড়, মংপু পাহাড়, কালিম্পং থেকে আঁকা তিব্বতের ছবি আছে।

এছাড়াও বাবার হিমালয়ের শীত, মংপুর বাগান, উত্তরায়ণের বাগান প্রভৃতির বহু ছবি আছে। গঙ্গার তীরের বহু ছবি এঁকেছেন বাবা।

বাবার শিল্প প্রতিভা শুধু চিত্রকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কাঠ ও চামড়ার কাজে তিনি ছিলেন সুনিপুণ শিল্পী। কাঠে তিনি রং দিতেন না। নানা রঙের কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ সাজিয়ে তিনি ছবি করতেন। বাবার হাতের তৈরী আসবাবপত্র বা ব্যবহারিক জিনিসপত্র দেখলে অবাক হতে হয়। বাবার ওয়ার্কশপ গুহাঘরে এখনো বাবার তৈরী জিনিস দেখা যায়; কাঠের শিল্পকর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিলন ঘটেছে সেখানে। তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনের গেস্ট হাউসে বাবার তৈরী আসবাবপত্র দেখা যেত। এখনও রতনকুঠি গেস্ট হাউসে তার কিছু নমুনা দেখা যায়। উত্তরায়ণের বাড়ীগুলিতে কাঠের কাজের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা তাঁর কাঠের কাজের নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। তা ছাড়া তিনি নানারকম কাঠের পাত্র, ট্রে, সিগারেট কেস প্রভৃতি নিত্যদিনের ব্যবহারের বহু জিনিস তৈরী করেছেন।

তিনি কাঠের কাজে ইনলে (Inlay) পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। এই ইনলে পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাচীন। তিনি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেননি কিন্তু এই পদ্ধতিকে তিনি তাঁর কাজের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এই প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে নূতন রূপ দিয়েছেন। তাঁর এই কাজের নমুনা রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় দেখা যায়।

আজকে আমাদের দেশে সুন্দর সুন্দর চামড়ার কাজের ছড়াছড়ি। চামড়ার বাটিক, চামড়ার ব্যাগকে লোকে শান্তিনিকেতনের ব্যাগ, শান্তিনিকেতনের বাটিক বলে। কিন্তু অনেকেই জানেন না আমাদের দেশে এই কাজের প্রবর্তক হলেন আমার বাবা।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত শিল্পী বীরভদ্র রাও চিত্রা (V. R. Chitra) বলেছেন—"Rathindranath was responsible for introducing Leather

Craft in India. In 1928, he went to Europe for treatment and during his convalscence in of those uptodate nursing homes he took to his hobby which he developed latter. He returned to Santiniketan with a lot of tools and opened a small class in his house to teach Leather Craft to some girls in the school. In about a year or two this new craft attracted several art students in the Kala-Bhavana and soon became one of the chief crafts in Sriniketan and Santiniketan. Today Leather Craft is a well paying handicrafts practised throughout India and the credit goes to Rathindranath."

বাবার কাঠ ও চামড়ার অসংখ্য কাজ আছে। তাঁর নিজের হাতে করা কাজের মধ্যে বকস এন্ড ক্যাসকেটস, আরটিকেলস অফ এভরিডে ইউজ, অফিস অ্যাকসেসরিজ, ফ্লক স্ট্যান্ড, ল্যাম্প স্ট্যান্ড, ওয়াকিং স্টিক, ডাইনিং রুম রিকুইজেটস, স্নোবাবস্ আউফিট ও নানা ধরনের লেদার ক্রাফটসের উল্লেখ করা যায়। এই সব কাজ যে বাবা কত করেছেন তার হিসাব নেই।

প্রথমে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা চামড়ার কাজে উৎসাহিত হয়। পরে বাবার চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে শিল্পসদন খোলা হয়। মা এ কাজে বাবাকে সব সময় সাহায্য করেছেন। স্থানীয় আশপাশের গ্রামের শিল্পীরা কাঠ, চামড়া, পটারী ইত্যাদি কাজ শিখে যাতে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্য বাবা নিজে তাঁদের কাজ শিখিয়েছেন।

অনেক আগে থেকে ছবি আঁকা, কাঠ বা চামড়ার কাজ করলেও বাবা তাঁর কাজের কোন রকম প্রচার কখনো চাননি। তিনি তাঁর নিজের মনে একান্তে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ বড় জানতে পারতেন না। নিজেকে গোপন করে রাখতে তাঁর মত আর বড় একটা কাকেও দেখা যেত না। অনেকবার অনেকে তাঁকে ছবির প্রদর্শনীর জন্য বলেছেন। কিন্তু তিনি তা প্রথমে এড়িয়ে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁর ছবির ও অন্যান্য কাজের প্রদর্শনী হয় অনেক পরে—১৯৪৮ সালে ১০ই মার্চ। দিল্লিতে তাঁর এই শিল্পকলার প্রদর্শনী হয়। অল ইন্ডিয়া আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস সোসাইটি সেই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বাবাকে অনেক আগে চীন থেকে একটি উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই উপাধি প্রদানের যে মূল অনুষ্ঠান তা হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু তাঁর এই সম্মানের জন্য শান্তিনিকেতনেও একটি উৎসব হয়। সেই সময় কলাভবনে

বাবার শিল্পকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও সম্ভবত বাবার জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে একবার মাত্র তাঁর চিত্র ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়েছিল।

তবে ১৯৫২ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকারের আনুকূল্যে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে বাবার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,

Sri Tagore (Rathindranath) had achieved great distinction in the sphere of art and craft. Being shy by temperament he was happy to remain in the background and never wanted to make his own work known to others except to his few friends, He was simply creating things of beauty at his besure only to appease his own asthetic impulse.

বাবার মৃত্যুর কয়েক বছর পর ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছবি ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়। ১৯৬৫ সালে পৌষ উৎসবের সময় কলাভবনের উদ্যোগে বাবার চিত্র ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়।

বাবার চিঠি

উত্তরপাড়া

মে, রবিবার, ১৯৩৪ সাল

পুষুমণি,

আমরা এবার এখানে এসে প্রথম দিকটা ভাল ছিলুম না। বোধ হয় গরম পড়তে আরম্ভ করায় শরীর খারাপ হয়েছিল। সকাল বেলায় প্রায় ১১টা পর্যন্ত রোজই খুব কুয়াশা করে থাকে—তারপর দুপুরে বেশ গরম পড়ে। বোলপুরেও ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই কমে গেছে, কিন্তু এখানকার মত গরম বোধ হয় না। সোমবার (কাল) আমার ফেরবার কথা—কিন্তু আরো দু-চার দিন থেকে যাব। শরীর আর একটু ভাল বোধ না করলে ফিরব না।

আশা করি তুমি নূতন ঘরে গুছিয়ে বসেছ। পর্দা খাটাবার একটা Rail বাকী ছিল—পাঠিয়ে দিয়েছি—সুরুল থেকে পর্দা এনে খাটিয়ে নিও। furnitureগুলি ঠিক করে দিয়েছে? আলোব fittings আমি কিনে পাঠিয়ে দিয়েছি—পৌঁছলে খুলো না। আমি গিয়ে লাগিয়ে দেবো।

ভূধরবাবুকে বলো অন্য কাজে হাত দিতে। সিঁড়ির ঘরের আলমারিটা শেষ করতে হবে—সেই ঘরে বুদ্ধমূর্তির জন্য যে কুলুঙ্গী হয়েছে—তার কাঠের সেল্ফ সুরেনবাবুর কাছে থেকে design নিয়ে করে রাখবেন। একতলায় থামের উপর আলোর shade গুলো ঠিক করে লাগাবেন। তারপর ৪টা বসবার seat অর্ডার দিয়েছিলুম, যেখানে চা খাওয়া হয় সেখানে দেওয়ালের ধারে—তাতে হাত লাগাতে পারেন—তুমি বুঝিয়ে দিয়ে তাড়া দিয়ে বলো আমি ফেরবার আগে কাজ এগিয়ে রাখতে। দোতালার বারান্দার পুরান বড় আলমারিগুলোও এখনো ঠিক

হয়নি।

পড়া কেমন চলছে? অঙ্ক শেখাতে প্রমথবাবু আসেন? বই সব না পেয়ে থাকলে অন্নদাকে বলো।

গাঙ্গুলী কেমন আছে?

বাবার খাওয়ার সময় দেখতে যাও? তিনি তেতলায় কেমন আছেন? এখনো ভালো লাগছে?

ইতি

'বাবা'

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal
সোমবার
May 1934

পুষুমণি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সেই সময় এখানে খুব হুলুস্থুল চলেছিল। হঠাৎ খবর পেলুম চীনদেশের রাষ্ট্রনেতা chiang kaishek এখানে আসছেন। তিনি এদেশে পৌঁছেই আগে এখানে আসবেন ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু গবর্নমেন্ট তা করতে দেয়নি। বড়লাটের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না যে এখানে একেবারেই আসেন। তাই দু-তিন দিন ধরে নানা রকম খবর পেতে লাগলুম। একবার খবর আসে আসবেন বলে, তারপরই cancelled হয়ে যায়। ভারি মুস্কিলে ফেলেছিল। আমার কাজই হয়ে পড়ল টেলিফোন ধরা, বড়লাটের বাড়ী থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর আসতে লাগল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পড়লেন। ১৮ জন লোকের ব্যবস্থা করা কি রকম হাঙ্গামা বুঝতেই পারছ। মা-কে খুব খাটতে হয়েছিল। আমি তখনো ভালো সারি নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে যতটা পারি করেছিলুম। যেদিন এলেন সেদিন একটু সুস্থ হয়েছিলুম reception দিতে যেতে পেরেছিলুম। আরো মুশকিল করল বাদলা। রীতিমত ঝড়বৃষ্টি দুপুর বেলা থেকে। সব খবরই অজিতকে বিস্তারিতভাবে কাল চিঠিতে দিয়েছি। মোটের উপর সব শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল। খুব খুশি হয়ে গেছেন।

জহরলালকে Madam Chiang Kaishek বলেছেন যে, খুব চমৎকার ব্যবস্থা—সুন্দর বাড়ী খুব ভাল সাজানো ইত্যাদি। ভারতবর্ষে সর্বত্রই খুব sensation হয়েছে যে আর কোথাও না গিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন বলে।

সন্তোষ ভঞ্জ কাল ফিরে এসেছেন। তার কাছ থেকে তোমাদের খবর পেলুম। শুনলুম তুমি না কি Sophia-র সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছ। সেটা কি ঠিক? Mrs. Wadia-কে আমরা চিঠি লিখতে পারিনি—এই সব হাঙ্গামার জন্য। তোমার কাছ থেকে ওঁর বোনের খবর পেয়ে সব বুঝতে পারলুম। তার আগে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে। Mrs. Wadia-কে জানিও কেন চিঠি লিখতে পারিনি। ওঁর বোনের জন্যও হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি। বিশেষত এখন যুদ্ধের কাবণে সবই ভয়ানক অনিশ্চিতভাবে চলছে।

সাবিত্রী এখানে জমি কিনেছে। অনেকেই জমি নিয়ে বাড়ী করছে।

এখানে এখন আবার বেশ শীত পড়েছে। খুব রীতিমত বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তারই ফলে। ফাল্গুন মাসে দোলের সময় এত শীত, অদ্ভুত লাগছে।

কেমন আছ এখন?

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'

পুষুমণি,

আমিও তোমাকে দোষ দিয়েছি যে চিঠি লেখো না কেন—আর তুমিও আমাকে সেই কথা লিখেছ আজ। দোষ বোধহয় দু'জনেরই। তুমি যে চিঠি শান্তিদের হাতে পাঠিয়েছিলে তা পেয়েছি আমি অনেকদিন পরে।

হাঁস-পায়রা সব ভালই আছে। মালী তাদের ঠিকমত রোজ খেতে দেয়। বড় হাঁস আরো ডিম দিয়েছে। কবে বসবে জানি না। আরো অনেক হাঁস হলে করবে কি? তোমাদের চাকর বেশ করে। চিঠিতে তিন কিংবা চার পয়সার স্ট্যাম্প দিয়ে দেয় আর রোজ আমাকে আরো দু' পয়সা দিয়ে নিতে হয়। কাগজগুলো যে ভারি—পাঁচ-পয়সার স্ট্যাম্প ছাড়া আসে না। বলে দিও।

এখানে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ে আসছে। কিন্তু বড় সব শুকিয়ে যাচ্ছে—বৃষ্টি না হওয়াতে। পুকুরের জল অনেক কমে গেছে।

দাদুকে পুরী যাওয়ার কথা বলেছি—কিন্তু দাদুকে তো চেনো—তাঁর মন স্থির করতে করতে তোমাদের হয়ত চলে আসবার সময় হবে।

একদিনও সমুদ্রে স্নান করবে না। তাহলে লোকে কি বলবে ? পুরী যাওয়াই ব্যর্থ হবে।

আমরা সব ভাল।

ইতি

'বাবা'

উত্তরায়ণ

৫ই মে

মঙ্গলবার ১৯৩৪

পুষুমণি,

তোমাকে ঘন ঘন লেখবার ইচ্ছা থাকলেও আজকাল একেবারে সময় পাই না। এত পাঁচ রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। দুপুর বেলায় এখন ভীষণ গরম—কিন্তু আমার ঘুম হয় না। আমি শুয়ে শুয়ে সারা দুপুর লেখা-পড়ার কাজ করি। অবশ্য এই সময়টা আরামে থাকি কেন না air condition চলে বলে খুব ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু তার দোষ এই যে বড্ড ঘুম পায় ঠাণ্ডাতে অথচ আমার ঘুমোলে চলে না। আর এক দোষ যখন ৪৷৷টার পর বন্ধ হয়ে যায় তখনো বাইরে খুব গরম হাওয়া—বেরোলে সব যেন পুড়ে যায়। এবারকার গরমটা ভারি অদ্ভুত Temp মোট ৯৯°/১০০° কিন্তু এত ঘাম হয়, আর রাত্রে হাওয়া বন্ধ হোলে যেন দম আটকে আসে। ঠিক ভাদ্র মাসের মত। এর মধ্যে একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। শিলাও বেশ পড়েছিল। এতক্ষণ ধরে ঝড় প্রায়ই হয়—সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ হলো রাত দশটায় শেষ হলো। কি ভীষণ বিদ্যুৎ। অনেকবার আলো নিবে গেল । কাছেই সাঁওতাল গ্রামে দুটো তালগাছে বাজ পড়ে পুড়ে গেছে। সেইদিন থেকে এখনো পর্যন্ত কলকাতার টেলিফোন লাইন ঠিক হয়নি। সেখানে দুদিন থেকে খুব গণ্ডগোল—প্রায়ইSiren বাজছে—ট্রাম বন্ধ রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ। জাপানী উড়োজাহাজ কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখনো কিন্তু বোমা ফেলেনি। বুবুদিদির এখানে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না সুবীরের জন্য ভাবনায়। আমাদের এখানে আত্মীয়ের ভিড় সম্প্রতি একটু কমেছে। বিবিদিদিরা কিছু দিনের জন্য কলকাতায় গেছেন। এনারা উদীচি ছেড়ে রতনকুঠীতে গিয়ে রয়েছে। বুবুদের বাড়ী হচ্ছে—হোলে তারাও শ্যামলী ছেড়ে সেখানে যাবে। দেবেনবাবু ও বেবিরা শীঘ্র কিন্তু আসছে। তারা কলকাতা ছেড়ে এখানেই থাকতে আসছেন। আপাতত আওয়াগড়ের বাড়ীতে থাকবেন।

এবারও আম ভাল হয়নি। এ অঞ্চলে কোথাও হয়নি। দু চারটে যা ধরেছিল তাও অধিকাংশ ঝড়ে পড়ে গেছে। এবারে গরমে কষ্ট করে রইলুম গাছের আম খেতে পেলেও একটু সান্ত্বনা থাকত, কপালে নেই।

কুকুরদের খবর সব ভালোই। তাদের চাকর বদল হয়েছে। সে ওদেরই বিশেষভাবে দেখাশোনা করে। খেয়ে খেয়ে চীন খুব মোটা হয়েছে আবার। ওর বাচ্চা দুটোই বেশ ভাল দেখতে হবে। তারা এরই মধ্যে প্রায় মায়ের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। কোনো গোলমাল করে না। ঠাণ্ডা মেজাজের। নিজেদের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে ঝগড়া বেধে যায়—তখন টেনে ছাড়াতে হয়। পুরুষটার নাম হয়েছে—"পালোয়ান" আর অন্যটা "পশমী"; চীনে হাঁস দুটো মরে গেছে—বোধহয় সাপে কামড়েছিল।

গোয়ালে গরু বাড়ছে—দুধও খুব হচ্ছে। ঘোড়াটা সবচেয়ে ভাল হয়েছে। মা আজকাল নিজেই টমটম হাঁকিয়ে বেড়াতে যান। ছোট্ট গাড়ীটার সঙ্গে টাট্টু ঘোড়া বেশ মানানসই দেখায়। তুমি এলে ঘোড়া হাঁকান শিখে যাবে।

বাবার চিঠিগুলো পেয়েছি। সব কপি করান হয়েছে। বইয়ের মধ্যে ছাপান হবে।

ইতি

বাবা

পুনঃ বাংলা বই বোধহয় তোমাদের বম্বের ঠিকানায় গেছে। অজিতকে বলে রেখো—তা না হোলে হারিয়ে যাবে—তুমি পাবে না। পাঠান হয়ে গেছে।

উত্তরায়ণ
6.5.34

পুষুমণি,

তোমরা ভোরবেলায় কখন ছাড়লে কেউ জানতে পারল না—তোমরা নিজেরাও বোধহয় জানতে পারনি। রাত্রে বেশ ঝড়বৃষ্টি এসেছিল—তাও বোধহয় টের পাওনি। সকালবেলায় গঙ্গা বেয়ে যেতে নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছিল—কিন্তু তারপর সমুদ্রে পড়ে কিরকম হোলো তা আর জিজ্ঞাসা করছি না। কে কিরকম বীরত্ব দেখালো জানিও। তবে আশা করছি এই সময় সমুদ্র নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা শান্ত মূর্তি ছিল।

তোমরাও চলে গেলে—আমিও এখানে পালিয়ে এলুম। এবার কলকাতায় একটুও ভাল লাগছিল না এখানে এসেই ভাল আছি। কিছুমাত্র গরম নয়। বৃষ্টি পড়ে চারদিকের মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছে। পরশুদিন শুনলুম এত শিল পড়েছিল যে আরিয়ামদা দু-দুবার ice cream বানিয়ে খেয়েছেন। সব সাদা হয়ে গিয়েছিল—ছেলেরা দু-চারটে যাও-বা আম রেখেছিল সবই গেছে।

আমাদের নীচু গাছে একটি মাত্র নীচু রয়েছে। তোমার মাকু ও পায়রারা ভালই আছে। আজ সকালে মাকু তোমার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তোমাদের সব খবর দিও। আর সকলেই ব্যস্ত থাকবে—তুমি মনে করে চিঠি দিও। ভুলো না।

ইতি

বাবা

'উত্তরায়ণ'

19.5.34

পুষুমণি,

এইমাত্র তোমার দ্বিতীয় চিঠিখানা পেলুম। এর আগের চিঠি ঠিক সময়ই পেয়েছিলুম ও অনেককে পড়ে শুনিয়েছি। তোমাদের জাহাজের কষ্টের কথা শুনে প্রায় সকলেই একটু মুচকে হেসে নিয়েছেন।

মাংসের চপ ice cream খেয়ে খাবার কষ্ট, জাহাজের দোলায় গা বমি। ঝড় না হোতেও Life belt পরা—ভীষণ ব্যাপার।

আজ Ceylon থেকে আরো অনেক চিঠি পেলুম। সুরেশবাবু, অনিল সবাই লিখেছেন ও খবরের কাগজ পাঠিয়েছেন। কাগজ পড়ে ত মনে হচ্ছে সেখানকার লোকেরা তোমাদের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে গেছে। এরকম প্রশংসা আর কোথাও করেনি। সুরেশবাবু যে রকম Programme পাঠিয়েছেন—তোমাদের ত এখন সারা দ্বীপটাই ঘুরে বেড়াতে হবে। Ceylon-এর Geography মুখস্থ হয়ে যাবে—পরীক্ষা হলে ১০০র মধ্যে ১০০ পেয়ে যাবে।

এখানে বেশ গবম চলছে। পুরশু দিন ১১২°—ছিল কোনদিনই ১১০°-এর নিচে যায় না। কাল বিকেলে আঁধির মত ধুলোর ঝড় হয়ে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু শুকনো গরম বলে আমার কোনো কষ্ট হয় না—শরীরও ভাল আছে।

কারখানায় খুব Machine-এর কাজ করি। এখন এখানে কেউই নেই। ধীরেন ছিল, সেও কলকাতায় চলে গেছে।

তোমাদের ওদিককার বৃষ্টি কিছু এদিকে পাঠিয়ে দাও ত মন্দ হয় না।

সেমন্তী, নুটুর খোকা সব কেমন আছে? হৈমন্তীকে বলো তার চিঠি পেয়েছি। আজ আর কাওকে জবাব দেওয়া হবে না। কুড়েমি লাগছে।তোমাদের খাওয়া দাওয়া ওখানে কেমন হচ্ছে? পিসীমাকে বলো যে দর্জ্জি বুড়ীর কাপড়ের কিছুই করেনি—কতগুলি বিনা সেলাইয়ে কাপড়ের টুকরো

ফেরত দিয়ে গেছে—সেগুলি কোনো কাজেই লাগা সম্ভব নয় তাই পাঠাইনি। আমার ভালবাসা নিও।

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'
29th May
1934

পুষুমণি,

তোমাকে অনেকদিন লিখতে পারিনি। অবিশ্যি আমার শেষচিঠিরও জবাব তোমার কাছ থেকে পাইনি। আসল কথা এখানে এত বেশি গরম পড়েছে যে কোন কাজই করতে ইচ্ছে করে না। এরকম বিশ্রী রকম ভাপসা গরম কখনো এখানে দেখিনি। পচা ভাদ্র মাসেও হয় না। শুকনো গরমেই অভ্যস্ত—তাতে শরীর ভালই থাকে। কিন্তু এবার কেবল ঘাম, রাত্রেও ঠাণ্ডা হয় না। তুমি এলে খুব কষ্ট পেতে। বোধহয় আর বেশি দিন এরকম চলবে না। বর্ষা শীঘ্র এসে পড়বে। তখন যদি তুমি এসো তবে ভালো হয়।

রতিবেণ (Mrs. Khandanwalla) সেই সময় আসতে পারে। তাকে জানিয়ে রেখেছি—অন্য লোক না পেলে তাকে বলতে পারো। সে নিশ্চয় 2nd Class-এ আসে। আমি অজিতকে তোমার আসা সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলুম, এখনো জবাব পাইনি। জানি না তার মত হবে কি-না? জাপানীরা বাংলার দিকে বোধ হচ্ছে এ যাত্রায় এলো না—আর কিছু দিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। বর্ষা একবার নামলে আর সম্ভাবনা থাকবে না।

২/৪ মাসের জন্য অন্তত নিশ্চিত হোতে পারি। তবে, অসুবিধা অনেক কিছু হবে। এরই মধ্যে কেরোসিন তেল, নুন, প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। ময়দা আটার অভাবে পাঁউরুটির অসম্ভব দাম হয়ে গেছে। এরপর পাওয়াই যাবে না। এখনো ইলেকট্রিক লাইট পাচ্ছি—কিন্তু তেলের অভাবে হয় তো দু-এক মাস বাদে বন্ধ হয়ে যাবে। ইস্কুলের বাস, বোলপুরের ট্যাক্সি সব বন্ধ। এখন আবার সনাতনী গোরুর গাড়ী।

গরমে মার একদিনের জন্য জ্বর হয়েছিল। এখন ভাল আছেন আমার চলে যাচ্ছে। Air condition-এর জন্য দুপুরটা আরামে থাকি—কিন্তু যখন বন্ধ হয় বা কাজে বাইরে যেতে হয় তখন বেশি কষ্ট হয়। কুকুররা গরমে কষ্ট পাচ্ছে।

তবে চীনের শরীর এখন ভালো আছে। রাতাদন খাটের নীচে শুয়ে থেকে খুব মোটা হয়েছে। বাচ্চা দুটোকে বলদেওকে সঙ্গে দিয়ে কোলকাতায় পাঠিয়েছি। তাদের দুজনেরই জ্বর হচ্ছিল। ডাক্তার দেখে বলেছে tick fever, এখন ভাল আছে। শীঘ্র ফিরবে। কয়েক দিন আগে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় হয়ে গেল। অধিকাংশ বাড়ীর মেয়ে মিলে করেছিল—মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বুড়ীমা (কৃষ্ণা) রানী সেজেছিল—মন্দ করেনি। কিন্তু চমৎকার করেছিল সে ক্ষীরি সেজেছিল। মমতার মেয়ে লুকু। অভিনয় সব সুদ্ধ খুব ভাল হয়েছিল। আমাদের বাড়ীতেই পশ্চিমের বারান্দায় দু'রাত্রি হয়েছিল।

অজিত শুনছি এবার একটু বেশিদিন তোমাদের কাছে থাকতে পারবে। সে বোধহয় খুব পিকনিক হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে। অনেক বন্ধু-বান্ধব তো এখন সেখানে আছে। তোমার রান্না তাকে খাইয়েছ ?

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'
১৫ই জ্যৈষ্ঠ
ইং মে, ১৯৩৪ সাল

পুষুমণি,

কাল তোমার চিঠি পেয়ে অনেক খবর জানলুম। প্রধান খবর হচ্ছে—তোমার দাঁতের কথা।ওখানে ভাল ডাক্তার পেয়ে তোমার এই দুঃখ যে ঘুচেছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। দাঁতের ডাক্তার হাতের কাছে পেয়ে অনেকেরই খুব সুবিধা হয়ে গেল দেখছি। তুমি ফিরলে দেখব কি তাহলে তোমার চেহারা বদলে গেছে ? উঁচু দাঁতটাকে কিন্তু আমার মন্দ লাগত না। মুখের এক কোণ থেকে মাঝেমাঝে দুষ্টুমি উঁকি মারত। এখন তোমরা খুব ঘুরে বেড়াচ্ছো। কলোম্বোতে বসে থাকার চেয়ে এখন বোধহয় ভাল লাগবে। তোমার এত খারাপ লাগছে কেন ? ছেলেবেলায় নতুন নতুন জায়গায় যেতে তো বেশ ভাল লাগে। কত নতুন রকমের মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা দেখা যায়। আর Ceylon ত খুব সুন্দর দেখতে দেশ।

কেমন পাহাড়, সবুজ গাছপালা, এত নারকেল গাছ, আর কোথাও নেই। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে ধানের খেত।

Kandy নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। Lake টা বেশ দেখতে নয়?কিন্তু এত

লোকের অসুখ করছে কেন ? নন্দর ত ম্যালেরিয়া আগে থেকেই ছিল। হৈমন্তীর শরীর সহজে ত খারাপ হয় না ? কালীমোহনবাবুর লঙ্কার ঝাল খেয়ে খেয়ে নিশ্চয়ই colic হয়েছে। তিনি কি ফিরে আসছেন ?

Kandy থেকে Jaffna-য় গেলে একেবারে আবার অন্যরকম লাগবে। সেটা বোধহয় একটু বোলপুরের মত। বালি মাটি ও তালগাছের দেশ। আমরা কখনো সেখানে যাইনি। তোমাদের কিরকম লাগে জানিও।

এখানে কাল থেকে মেঘ করে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আজ সমস্তদিন মেঘলা ও ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই।

মাকু বোধহয় কয়েকদিন হলো দেওয়ালের গর্ত থেকে তার বাচ্চাদের নিয়ে অন্য কোথাও গেছে। তাকে দেখছি না। বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে গাছপালার মধ্যে চলে গেছে। কয়েকদিন হলো পর পর দুটো বেড়াল ধরেছিলুম। একটাকে কালু বস্তার মধ্যে ভরেছিল। সে দু মিনিটের মধ্যে বস্তা ছিঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। অন্যটাকে বন্দুক দিয়ে মেরে দিয়েছি। আর বোধহয় পায়রা খেতে কেউ আসবে না।

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'
১লা জুন ১৯৩৪

পুষুমণি,

তোমাদের অনেকদিন আবার কোনো খবর পাইনি। কলম্বো ছেড়ে অবধি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে বলে বোধহয় চিঠি লেখবার সময় পাও না। মাঝে তো আবার কলোম্বো ফিরে এসেছিলে। বাইরে কি রকম লাগছে ? Kandy নিশ্চয়ই ভাল লাগবে—সুন্দর জায়গা—কেমন Lake। আমাদের এখানে জলের জন্য হাহাকার, তোমরা চলে যাবার পর একদিন মাত্র একটু জল হয়েছিল। অথচ শুনেছি চারিদিকে জল ঝড় হচ্ছে। কলকাতায় খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে।

তোমার মাকুর বাচ্চাদের কিছুতেই ধরতে পারলুম না। তাদের নিয়ে মাকু একটা গাছের গর্তের ভিতর এমন লুকিয়ে থাকে তার ভিতর হাত যায় না। দেখো তুমি এসে বাচ্চাদেরও পোষ মানাতে পার কি-না। পায়রা সব ভালই আছে। আর বেড়ালের উৎপাত হয় না। গরু খুব দুধ দিচ্ছে। তুমি ভাবছ আমি

বুঝি খুব দুধ খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছি। তা মোটেই নয়—আমার ঠিক বরাদ্দ মত খাওয়া চলে। কাল আলি সাহেব চলে গেল—তাকে খাওয়ালুম। শীঘ্র আশারাও চলে যাবে, তোমাদের খবর খবরের কাগজে বেরোয় না কেন—তাহলে সুবিধা হতো আমরা টাট্‌কা-টাট্‌কা খবর পেতুম—কি করছ। তোমাদের চিঠি আসতে অনেক দেরি লাগে।

ইতি
'বাবা'

'উত্তরায়ণ
১৯৩৪ জুলাই

পুষুমণি,

তোমার চিঠি আর পাচ্ছি না। কয়েকদিন হলো অনিলকাকার চিঠি পেয়েছিলুম।

Ceylon-এ নিশ্চয়ই এখন খুব বৃষ্টি নেমেছে।

এখানে কয়েকদিন থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

প্রথমদিন যেদিন হলো—বৃষ্টির সঙ্গে কী ঝড়। দেখতে কিন্তু চমৎকার লাগছিল। ঝড়ে কোনো ক্ষতি করেনি। গরম বেশ কমেছে। তোমরা যখন আসবে তখন গাছপালা আবার সবুজ হয়ে গেছে দেখবে। এমন গরম পড়েছিল যে ভয় হয়েছিল অনেক গাছ মরে যাবে কিন্তু কোনোরকমে বেঁচে গেছে—আর ভয় নেই।

আজ সকাল বেলায় মহা বিপদ। চা খাচ্ছি—তখন মালি এসে বললে হরিণটা দড়ি ছিড়ে পালিয়েছে। খোঁজ খোঁজ, কোথাও পাওয়া গেল না। সুধাকান্তদা তখুনি ত পুলিশকে এক লম্বা চিঠি লিখে ফেললেন হরিণ ধরে আনবার জন্য, এমন সময় গোপাল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে হরিণটা বোলপুরের কাছে শালবনের মধ্যে ঢুকেছে। সেইখানে লোক পাঠাচ্ছি—এমন সময় দুজন লোক গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ধরে আনছে দেখি। এসেই যেন কিছুই হয়নি—ভালমানুষের মত মুড়ি খেতে লাগল। কি দুষ্টু দেখেছ ?

তোমাদের সব খবর জানবার জন্য খুব ইচ্ছে করে। মাকে চিঠি লিখতে বলো না কেন ?

ইতি
বাবা

Taj Mahal Hotel
Bombay
25.3.85

পুষুমণি,

আমরা আজ সকালে বোম্বে পৌঁছে এই হোটেলে এসে উঠেছি। তোমরা এই হোটেল নিশ্চয়ই সেবার দেখে থাকবে। একেবারে সমুদ্রের ধারে। জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। জাহাজ যেখান থেকে ছাড়বে তার কাছেই। অনেকগুলো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা আমাদের এখনো চিনতে পারিনি।

ট্রেনে কি ধুলো সে আর কি বলব। ধীরেনদা'র কাজই ছিল একটা গামছা দিয়ে ক্রমাগত ধুলো মোছা। ধুলো খেয়ে, তোমার মায়ের একটু হাঁপানী হয়ে গেল। এখানে এসে ভাল বোধ করছেন। নতল ও ইন্দুদের টেলিগ্রাম করেছি দেখা করতে—এখনো খবর পাইনি।

দাদামহাশয় নিশ্চয়ই ফিরে গেছেন। কোথায় এখন থাকছেন জানিও। আর তাঁর খাওয়া দাওয়া দেখো। তোমাদের সবাইকার খবর বুধবারে, বুধবারে, লিখে সুধীন্দ্রকে দিও পোস্ট করার জন্য।

আজ এই পর্যন্ত —এখন স্নান করে গায়ের ধুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। কাল ছাড়বার আগে টেলিগ্রাম করব।

সুধীন্দ্রকে এই চিঠিটা দিও।

ইতি
বাবা

Red Sea
30.3.35

পুষুমণি,

আরব্য সাগর পার হয়ে এলুম। আজ Aden-এর সামনে দিয়ে চলে এসে Red Sea-তে ঢুকে পড়েছি।

Aden-এ জাহাজ থামল না—একেবারে Port Said-এ গিয়ে থামবে। খুব জোরে যাচ্ছে—রোজ প্রায় ৪৫০ করে চলছে। সমুদ্র খুব ভাল—এমন কি বুড়ীরও কোন অসুখ করেনি।

বোম্বেতে তোমার ইন্দুদি, নতলদা, প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই দেখা হোলো। তাঁরা আমাদের রাত্তিরে জুহুতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ীর কাছে। রাত্রে সমুদ্রের

ধারে বালির উপর বসে পিনাকিনের গান হোলো ।তার ফলে কিন্তু তোমার মায়ের পিঠে ব্যথা হয়ে দুদিন উঠতে পারেননি। এখন ভাল আছেন।

Red Sea-তে গরম হবার কথা—কিন্তু বেশ হাওয়া আছে—আমরা বেশ আরামে যাচ্ছি।

তবে শেষ পর্যন্ত কি রকম হয়, বলতে পারি না। তোমাদের ওখানে এতদিনে নিশ্চয় ভীষণ গরম পড়েছে। তোমাকে মা নিশ্চয়ই চিঠি লিখবেন—তাই এবার আমি আর বেশি কিছু লিখলুম না।

তোমার ক্যামেরার একটা film আমার ব্যাগে চলে এসেছিল—সেটা develop করতে জাহাজে দিয়েছিলুম—তিনটে ছবি উঠেছে, পাঠালুম। তুমি তুলেছিলে ?

ইতি
বাবা

France
19.4.35

পুষুমণি,

তোমাদের চিঠি অনেকদিন পর্যন্ত না পেয়ে আমরা মনে করেছিলুম যে চিঠি লিখতে তুমি ভুলে গিয়েছ। কিন্তু তিন চার দিন আগে একসঙ্গে তোমাদের সকলের চিঠি পেয়ে বুঝলুম ঠিক সময়মতই চিঠি লিখেছ কিন্তু air mail-এ না পাঠিয়ে জাহাজে পাঠিয়েছ তাই এত দেরি হয়েছে। এবার থেকে সুধীন্দ্রকে বোলো সব চিঠি air mail-এ পাঠাতে, তাহলে খুব শীঘ্র আসবে। বাবা সাতদিন আগে যে চিঠি লিখেছেন আমরা এখানে বসে সে দিন সেই চিঠি পেলুম। এত শীঘ্র চিঠি পেলে বেশ লাগে,মনে হয় না যে এত দূরে আছি। আমি এই চিঠি air mail-এ পাঠাচ্ছি কদিনে তোমার কাছে পৌঁছায় তারিখ দেখো।

কিন্তু তুমি যে রকম হাতের লেখা করেছ তাতে আমার পক্ষে তোমার চিঠি পড়াতো দুঃসাধ্য। বুড়ীকে বললুম পড়ে দিতে। হাতের লেখা স্পষ্ট করবার চেষ্টা কোরো।ধরে ধরে লিখো। হাতের লেখা একবার খারাপ হলে আর ভাল হবে না।

ছুটির মধ্যে পড়ার ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে কি-না জানিও। যদি কোনো অসুবিধা থাকে দাদামহাশয়কে জানিও।

এই ছুটির মধ্যে সব বিষয় এগিয়ে রাখতে হবে। আঁদ্রেরা খুব দুঃখিত তুমি

এলে না বলে। তোমার ছবি দেখে খুব খুশি। এত বড় হয়েছ মনে করেননি। আঁদ্রেও ভাল—সামনের শীতের সময় শান্তিনিকেতনে যাবেন—তখন তোমাকে আবার দেখবেন। তার মধ্যে আরো একটু বড় হয়ে নিতে পারবে।

তুমি তোমার ঘর সব মেরামত করে গুছিয়ে নিচ্ছ জেনে খুশি হলুম। কিন্তু দরকার হলে সুরেন কাকাকে ডেকে বোলো মিস্ত্রিদের তিনি বুঝিয়ে নেবেন।

দাদু-যদি শীঘ্র না ফিরেন ত তাঁকে চিঠি লিখে আনিয়ে নিও।

আমরা দু-চার দিন পরে ইংলণ্ডে যাব।

ইতি

বাবা

Hotel Regina,
8th May. 1935

পুষুমণি,

লণ্ডনে কাল এসে তোমাদের সকলের অনেক চিঠি একসঙ্গে পেলুম। কয়েকদিন কোনো চিঠি পত্র পাইনি—সব এখানে জমা ছিল। কাল একসঙ্গে সব পেলুম।

তোমাদের ওখানে কত উৎসব হয়ে গেল—আমরা দেখতে পেলুম না। নববর্ষের খবর এবারকার চিঠিতে জানতে পারলুম—জন্মোৎসবের খবর পেতে এখনো দেরি আছে। সবে কালতো হয়েছে। আমরা তখন প্যারিস থেকে লণ্ডনে আসছি—আর বুড়ীদিদি জাহাজে উঠে যা কাণ্ড করল।

Conle Rosso-তে এসে ভারি জাঁক হয়েছিল—মনে করেছিল আর বুঝি Sea Sick হবে না। English Channel-এর সামান্য সমুদ্রে সব দর্প-চূর্ণ হয়ে গেল।

Regina hotel-এ এসেই দেখি তোমার পরিচিত সেই কালো বেড়াল দুটো। তারা ঠিক আছে। এখানে বেশি থাকব না। পরশু দিন Dartington hall-এ যাব। আজ Elmhirst-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললুম। আমার আর এদেশ ভাল লাগছে না। ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। আর বেশি দিন দেরি নেই—এই মে মাসটা শেষ হলেই যাবার ব্যবস্থা করব।

ঠিক যখন বর্ষা নামবে তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়ব। তোমাদের গরমে কি রকম কষ্ট হচ্ছে? Tube-Well-এ জল আছে ত? খসখস ভিজিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখতে পার? ছুটির সময় পড়া কি রকম চলছে? মামা ফিরে এসেছেন?

ইতি

বাবা

Dartington Hall
20. 5. 35

পুষুমণি,

এইমাত্র সকাল বেলায় উঠেই তোমার এক মস্ত চিঠি পেলুম। এইরকম চিঠি লিখলে খুব ভাল লাগে পড়তে। এবার লেখাও বেশ স্পষ্ট হয়েছে··· মাঝে মাঝে যে কি সাপ-ব্যাঙ লিখো তার ঠিক নেই। সপ্তাহে একদিন করে এইরকম বাড়ীর সব ছোটখাটো ঘটনা উল্লেখ করে গুছিয়ে চিঠি লিখো। কোন দিন ছাড়ে সুধীন্দ্রের কাছ থেকে জেনে নিও—ঠিক সেই দিন যদি পোস্ট করো তবে আমরা সাতদিনের মধ্যে চিঠি পেয়ে যাবো। পুরাণ খবর জানতে তত ভাল লাগে না···যত টাটকা খবর।

তোমাদের কোথাও পাহাড়ে যাওয়া ঠিক হোলো কি-না জানতে ইচ্ছে করছে। আমরা গরমে পালিয়েছি সত্যি···কিন্তু ইংরেজিতে একটি কথা আছে "from the frying Pan into the Pire" আমাদের তাই দশা হয়েছে। যেদিন জাহাজ থেকে নামলুম ঠিক সেই দিন থেকে এমন ঠাণ্ডা পড়ল যে তোমার মা প্রথমে তারপর আমি সর্দিজ্বর নিয়ে কয়েকদিন ভুগলুম। সেই ঠাণ্ডা আর কিছুতেই যাচ্ছে না। একদিন একটু রোদ হয়ত তারপর দিন বৃষ্টি নয়ত বরফ। কয়েকদিন আগে এখানে বরফ পড়ে সব সাদা হয়ে গেল।

মে মাসে এরকম বরফ কেউ কখনো দেখে নি। শীতকালেই এখানে বরফ পড়ে না। ইন্দ্রদেব আমাদের শাস্তি দেবার জন্যই বোধ হয় এইরকম ষড়যন্ত্র করেছেন। কিম্বা তোমাদের শাপের ফলে এইরকম ব্যাপার ঘটছে। কে জানে।

তুমি বাড়ীর সব মেরামত করিয়ে পরিষ্কার করে রাখ জেনে খুশী হলুম। মালী যদি নিতান্তই বাড়ী যেতে চায় তা যেতে দিও, কিন্তু একমাসের মধ্যে ফেরা চাই। বর্ষার গোড়ায় আমরা ফিরব—সেই সময়ই গাছ পোঁতবার সময়— তখন না থাকলে অসুবিধা হবে।

দাদামহাশয়ের শরীর কেমন আছে? খাওয়া-দাওয়া তোমরা দেখো ত? নতুন বাড়ী তাঁর কি রকম লাগছে। তুমি তাঁর কাছে পড়ছ। সমস্ত দিন পড়া করবার দরকার নেই। বিকেল বেলায় কাওকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে দূরে বেড়াতে যেও। খোয়াইতে বেড়াতে ভাল লাগবে । তারপর ঘরকন্নার কাজ এই সময় সুধা দিদির কাছে শিখে নিতে পার।

আমরা সব ভাল আছি। এখানে যেন ঘরবাড়ী হয়ে গেছে। বাড়ীর এক

দিকটা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে—নিজেরা বেশ গল্পগুজব করে সময় কাটাই।

ইতি

বাবা

উত্তরায়ণ

24. 5. 35

পুষুমণি,

এবার তোমাকে খুব বড় করে চিঠি লিখব না। কয়েকদিন আগেই একটা মস্ত চিঠি দিয়েছি। তবে চিঠির বদলে দু-একটা ছবি পাঠাচ্ছি। দিদির ছবি কি রকম হয়েছে ? অন্য ছবিটা আঁদ্রেদের বাড়ীতে তোলা। ওদের বাগানটা বেশ দেখতে, না ? আঁদ্রেরা এখানে এসেছেন। তুমি যা বলতে বলেছিলে তাঁদের বলেছি।

দিদি কাল নাচ দেখাবে। বাজনা ছাড়া নাচতে অসুবিধা হবে। তবে একজন লোক এখানকার কয়েকটী গান পিয়ানোতে অভ্যাস করে নিয়েছেন। মন্দ বাজাচ্ছেন না। দিদির মহাভাবনা ও ভয় উপস্থিত হয়েছে। এখানে একটি নাচের ইস্কুল আছে—সেখানকার লোকেরা নাচ দেখাবার জন্য খুব ধরেছে। তারা উদয়শংকরের নাচ দেখেছিল। খুব ভালভাবে হয়েছিল, ও ভাল লেগেছিল। দিদির গান শুনে লেনার্ডদের খুব ভাল লেগেছে। প্রায়ই রাত্রে খাবার পর গান-বাজনা হয়। এখানে একটি এস্রাজ পড়েছিল। সেটা দিদির গানের সঙ্গে বাজাই। ছুটিতে এখন ভাল লাগছে। মা আজ রান্নাঘরে। লেনার্ডেব সন্দেশ খেতে ইচ্ছে—তাই করতে গেছেন।

ইতি

'বাবা'

Dartington Hall

01. 6. 35

শনিবার

পুষুমণি,

আজ সকালে উঠেই দেখি দিব্যি ঝকঝকে রোদ দেখা দিয়েছে—কালকের বৃষ্টির পর গাছপালা ঘাস সূর্যের আলোতে আরো যেন সবুজ দেখাচ্ছে। মনে হোলো আজকের দিনটা বেশ কাটবে যদিও আমি এখন এখানে একলা রয়েছি। বেরিয়ে এসেই দেখি টেবিলের উপর একগাদা চিঠি রয়েছে—সবই প্রায় দেশ

থেকে এসেছে। এবার কেউই বাদ যায়নি, বাবা চন্দননগর থেকে আর আশ্রম থেকে তোমার, সুধার, সুরেনবাবুর, তনয়বাবুর, সুধাকান্তর আবার সুরুল থেকে গোরার এক রাশ চিঠি। পড়তে পড়তেই সকাল বেলাটা কেটে গেল। চিঠিগুলো পড়া হোলে আবার খামের ভিতর পুরে তোমার মার কাছে লণ্ডনে পাঠালুম। তোমার মা ও দিদি কয়েক দিনের জন্য সেখানে গেছেন। লন্ডন শহর দিদিরও ভাল করে দেখা হয়নি—দিদি সেই মতলবে গেছে—অনেক museum, থিয়েটার, Parks কত কি দেখবার আছে। মা গেছেন আলাপী বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে—আঁদ্রেদের সঙ্গে এক হোটেলে আছেন। একটা ভাল নাচ হচ্ছে—সেটাও দেখবার ইচ্ছে আছে। একজন South America-র মেয়ে 'Argentina' এখন খুব বিখ্যাত নাচিয়ে হয়ে উঠেছে। সে Spanish নাচ দেখায়। আমরা তাকে অনেক বছর আগে প্যারিসে দেখেছিলুম—তখন তার অত নাম হয়নি। সুরেন কাকাও দেখেছিলেন। এখন নাকি খুব ভাল নাচে। তোমার দিদি এখানে নেচে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে। একজন জার্ম্মানকে ভাগ্যিস কয়েকটা গান শেখাতে পেরেছিলুম—সে পিয়ানো না বাজালে কি করে সে নাচ সম্ভব হোতো জানি না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু খুব ভাল হয়েছিল। তুমি থাকলে দিদিকে সাহায্য করতে পারতে।

শুনলুম তুমি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছ। কি বল্লেন লেখো নি ত ? চোখ দেখিয়েছিলে ? দাদা মহাশয় লিখেছেন বোটে তাঁর ভাল লাগছে। তোমার বোলপুরে ফিরে এসে ভাল লাগছে শুনে খুশী হলুম। আশা করি এখন থেকে মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হবে। বেশি দিন ঐরকম শুরু গরম চল্লে বেচারা গাছপালাদের মহা মুস্কিল হবে। গিয়ে দেখব অনেক ভাল গাছ, হয়ত মরে গেছে। এখানে খুব সুন্দর বাগান—এই সময়ে কত যে ফুল ফুটেছে। Elmhirst আবার একটা গাছের ব্যবসা খুলেছেন। সেই Nursery থেকে অনেক ফুলের গাছ নিয়ে যাচ্ছি। দেশ বিদেশ থেকে অনেক গাছের সংগ্রহ সেখানে আছে। গাছ দেখলেই লোভ হয়। কলকব্জা দেখলেও আমার লোভ হয়—কিন্তু সে লোভ এবার সম্বরণ করছি।

আমাদের জাহাজ Genoa থেকে 26th ছাড়বে, ভেবেছিলুম আর একটা জাহাজ নিয়ে লন্ডন থেকে Genoa পর্যন্ত যাব। কিন্তু এখনো সুবিধামত সন্ধান পাই নি। এখানকার ট্রেনে বেশি লম্বা Journey আমার ভাল লাগে না। ১০-১২ই জুলাই দেশে পৌঁছাব—ঠিক যখন ইস্কুল খুলছে। আর ত বেশি দেরি নেই। তুমি ঠিকই লিখেছিলে—মা যদি আরো দু-তিন মাস থেকে যেতেন ত

ভালো হোতো—কিন্তু তিনি তা চাচ্ছেন না। এখন শরীর এত ভাল আছে যে অসুখের কথা ভুলে গেছেন। চাকরদের এখান থেকে চিঠি লিখতে বোলো যাতে আমরা ফেরবার আগেই তারা ফিরে আসে। এখন থেকে খুব তাড়া না দিলে কেউই ফিরবে না—তখন মহামুস্কিল হবে। সুধাদিদিকে বোলো মাঝে মাঝে চিঠি দিতে।

তনয়বাবুর কাছে পড়তে ভাল লাগছে জেনে খুশী হলুম। ওঁর কাছে একমাস পড়লেই অনেক এগিয়ে যাবে। ছুটির সময় কিন্তু মাঠে, ঘাটে, নদীর ধারে, জঙ্গলে খুব বেড়াতে যেও। কেবল গল্প করতে নয়—চারিদিকে চোখ খুলে দেখো—ভাল করে দেখলে কত নতুন জিনিস দেখবে—গাছপালা, পোকামাকড়, পাথর, বালি, লোকজন। ঘরবাড়ী সব কিছুর মধ্যেই তলিয়ে দেখলে অনেক কিছু শেখবার পাবে। অনেক লোক আছে, যে জায়গার মধ্যে বাস করে তার চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কিছুই পরিচয় নেই। একটা গাছের বা পাখীর নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। সময় পেলে রান্নাও শিখে নিও।

সেদিন Paignton-এ গিয়েছিলুম। Andrews সাহেবের সঙ্গে দেখা হোলো। তারপর Marrianne-ও তার মার সঙ্গে দেখা হোলো। এখন মস্ত বড় হয়েছে—তোমাকে মনে আছে—তোমার জন্য অনেকগুলো ছবি দিলে—একসঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমাকে দেখে খুব খুশী। তোমার মনে আছে ত?

ইতি
বাবা

Dartington Hall
7. 6. 35

পুষুমণি,

গত ডাকেও তোমার চিঠি পেয়েছি। মা তখন লন্ডনে ছিলেন। তাই চিঠিগুলো পড়ে আবার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। মা এখন ফিরে এসেছেন। আঁদ্রেরা লন্ডনেই রয়ে গেছেন। আমরা যখন লন্ডনে আবার যাব তখনও তাঁরা থাকবেন, দেখা হবে। এবার শীতকালে আঁদ্রেও ডাল শান্তিনিকেতনে অনেকদিন এসে থাকবেন। তাঁর আগে তুমি ফরাসী কথা ভাল করে অভ্যেস করে রেখো, তাহলে বেশ ওঁদের সঙ্গে কথা কইতে পারবে। শুনছি দুটি ফরাসী ছেলে মোটরে করে আশ্রমে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারো।

দিদি লন্ডনেই থেকে গেছে। খুব museum, cinema—প্রভৃতি দেখছে। পাশ করার খবর পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। এখানে তিনদিন খুব ঝড় বৃষ্টি চলছে। সাধারণত এদেশে টিপটিপানি বৃষ্টি পড়ে থাকে। কিন্তু এই কয়েকদিন আমাদের দেশে যেমন নতুন বর্ষাকালে খুব ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি পড়ে সেই রকম আবহাওয়া হয়েছে। বাইরে বেরোতে পারছি না। তাই ঘরে বসে বই পড়ছি বা চিঠি লিখছি। এরকম কুঁড়েমি করতে আমার যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। Quetta-য় খুব ভূমিকম্প হয়ে গেছে কাগজে পড়লুম। তোমরা শান্তিনিকেতনে কিছু অনুভব করেছিলে? বোধহয় এতদূর পৌঁছায়নি।

চাকরদের খবর দিতে ভুলো না। আমরা Victoria জাহাজে যাবো ঠিক করেছি। এ জাহাজটাও খুব ভালো শুনেছি। ২৬শে জুন Genoa থেকে ছাড়বে। ৭/৮ জুলাই বম্বে পৌঁছবে। তার মানে ১০ই জুলাইর মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছে যাব। ঠিক ১০ই ইস্কুল খুলবে না? কেমন আমরা সব বুঝে যাচ্ছি?

আশা করি সব ভালো আছ।

ইতি
বাবা

লণ্ডন
১৬-৬-৩৫

পুষুমণি,

কাল বিকেলে তোমাদের চিঠি পেলুম। এবার অনেক দিন বাদে চিঠি পাচ্ছি। মাঝে একটা air mail তোমরা বাদ দিয়েছ নিশ্চয়। গত সপ্তাহে বাবারও না, তোমাদেরও চিঠি পাইনি, এবার আবার দাদুরও চিঠি পেয়েছি। এতদিন পরে তোমাদের কাছে এসেছেন। এখন তোমাদের নিশ্চয়ই বেশ জমেছে। দাদুকে গল্প বলতে ধরো না।

কাগজে দেখলুম কাল অর্থাৎ ১৫ই জুন বম্বেতে Mon Soon আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিনেই ৩ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়েছে। তাহলে যখন এই চিঠি পাবে তখন ভীষণ গরমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ নিশ্চয়ই। বৃষ্টিতে সব ভাসিয়ে দিয়েছে। গাছপালা আবার সবুজ হয়ে উঠছে। আর আমরা যখন পৌঁছাব তখন ত পুরোপুরি বর্ষা। ভিজতে ভিজতে গিয়ে নামবো। এখানে আমাদের আসছে সপ্তাহটা থাকতে হবে তারপরেই ২৩/২৪শে একেবারে Genoa র জন্য রওনা

দেবো। কোথাও আর থামব না। সেখান থেকে ২৭শে জাহাজ ছাড়বে। আমাদের জাহাজে আম্বালালরাও ফিরছেন। লীলার সঙ্গে আবার দেখা হবে। খুব বেশী লোক বোধহয় থাকবে না—Mon Soon-এর ভয়ে এই সময় কেউ বড় যায় না।

আমাদের চিঠি আর বেশী পাবে না। Geenoa ছাড়বার আগে একটা চিঠি ছেড়ো—তারপর ত যা Post করব আমাদের সঙ্গেই জাহাজে যাবে। দেশে ফিরছি মনে করতেও ভাল লাগছে। বাড়ী ছেড়ে বিদেশে থাকতে এখন আর ভাল লাগে না। তোমাদের কাছে পৌঁছালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।

ইতি
'বাবা'

2, Ladbroke Sqr.
London
22. 6. 35
শনিবার

পুষুমণি,

আমাদের এখান থেকে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পরশু দিন দুপুর বেলা ২টার সময় এখান থেকে ছাড়তে হবে। আবার সেই Channel পার হতে হবে। এবার তোমার দিদি তত কাবু না হোতেও পারেন। আজ থেকে আকাশ খুব পরিষ্কার হয়েছে। কাগজে বলছে যে এখন কয়েক দিন ভাল weather চলবে। বেশ গরমও পড়েছে। অর্থাৎ কি-না গরম কাপড়গুলো একটু বেশী মনে হয় হাঁটাহাঁটি করলে। পরশু দিন ছেড়ে তারপর দিনই মঙ্গলবার Genoa-তে ১১৷৷টা দুপুরে পৌঁছে যাব। রাতটা ট্রেনে কাটাতে হবে। আমার সেটা ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। Genoa-তে আমাদের ঘরের লোক রয়েছে—তোমার এলা দিদি—এবার আর কোথাও নাবছি না—একেবারে Genoa-তে গিয়ে পড়ব। সেখানে দুদিন বিশ্রামের সময় পাব—তারপর তুমি চেনো না। উনি একজন ইটালিয়ানকে বিয়ে করেছেন তাঁর নাম "দিনো"। বড় চমৎকার লোক। একটি ছোট ৫/৬ বছরের মেয়ে আছে—তাকে আমাদের খুব ভাল লাগে—ভারি মিষ্টি। কাজেই Genoa-তে থাকতে আমাদের বেশ ভালই লাগবে। আশা করছি এবার গিয়ে ইটালীতে একটু গরম পাব। এখন একটু গরম পেলে যেন আরাম করে। তোমরা গরমে পুড়ে গরম আবার ভাল লাগে শুনে চটে যাবে। তোমাদের

ওখানে এখন নিশ্চয়ই খুব বৃষ্টি নেমেছে। সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম বোম্বেতে একদিনের মধ্যে ১০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়ে সমস্ত রাস্তা ঘাট ভেসে গেছে। তোমরাও তাহলে এত দিনে নিশ্চয়ই বর্ষা পেয়েছ।

বৃষ্টিতে ভিজতে কোনদিন বেরিয়েছিলে ? তুমি যা বলেছিলে সব নিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আংটি ঘড়ি আজকাল পাওয়া যায় না। অন্ততঃ লন্ডনে মিল্লো না। আমরা ত Switzerland-এ গেলুম না—মায়ের ঘড়িটা যেখান থেকে কিনেছিলুম। যা হোক, আর যা নিয়ে যাচ্ছি আশা করি, কাজে লাগবে। আর তুমি দেখে খুশী হবে। এখন সব বলছি না।

ইতি
'বাবা'

শান্তিনিকেতন
রবিবার

পুষুমণি,

কাল এখানে বেশ দেওয়ালি হয়েছিল। উত্তরায়ণ শ্যামলী দুটো বাড়ীতেই প্রদীপ, মোমবাতি অনেক জ্বালানো হয়েছিল। তোমার দাদু আবার কিছু বাজি কিনিয়ে আনিয়েছিলেন। এখানকার ছেলেমেয়েরা সবাই এসে সেগুলো নিয়ে খুব মজা করল। পটকার আওয়াজে কান বন্ধ করে থাকতে হয়েছিল। আমি একটা মস্ত bonfire -এর আয়োজন করেছিলুম। যেখানে যত গাছপালার ডাল পড়েছিল, সংগ্রহ হয়েছিল আর তাতে কারখানা থেকে এক টিন তেল এনে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। আগুনটা খুব চমৎকার দেখতে লাগছিল। প্রায় দোতলা সমান উঁচু হয়ে জ্বলতে লাগল। এটায় আমোদও হল, অনেক পোকা নষ্ট হল। ক'দিন বেজায় পোকা হয়েছিল। এইসব আমোদপ্রমোদের পর জনকয়েককে খাওয়ান হল। রান্না প্রায় সবই চতুর করেছিল, menu কি হয়েছিল লিখছি—ডালপুরী, টকছোঁকা, ডিমের দম, মাংসর কোর্ম্মা, দয়েবড়া ও জিলিপি। খুব ভাল রান্না হয়েছিল—সকলে খুব পেট ভরে খেয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত গল্প গুজব করল। কাল আমাদের এখানে উৎসব হল দেখে সুরুলের লোকে ভাবল আমাদের এখানেও কিছু করা উচিৎ। তাই এখন দেখছি গৌরদার এক নেমন্তন্ন চিঠি এসে হাজির আজ বিকেলে, সেখানে দেওয়ালি হবে। এবার ছুটিতে খুব খাওয়া দাওয়া চলছে দেখছি।

তোমার কোনো ভয় নেই—তোমার পড়ার ঘর ভালই হবে এসে দেখবে।

গুছিয়ে রেখে দেবো। আর তো সময় হয়ে এলো আসবার।

ইতি
বাবা

কমলানিবাস
বারগণ্ডা
গিরিডি
রবিবার

পুষুমণি,

কাল বেশ মেঘলা ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল অথচ বৃষ্টি হয়নি—তাই আসতে রাস্তায় একটুও কষ্ট হয় নি। অণ্ডালে নেমে ১৮ মাইল, মোটরে এসে আসানসোলে সেনদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে খানিকটা জিরিয়ে আবার ৩টার সময় মোটরে বেরোনো গেল। গিরিজা মোটর নিয়ে অণ্ডালে দু দিন অপেক্ষা করেছিল—তাকে স্টেশনেই পেয়েছিলুম। রাস্তাটা খুব চমৎকার। বিশেষ বর্ষাকাল বলে ধুলো একটুও নেই—চারিদিক বেশ সবুজ, দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। পরেশনাথ পাহাড়ের চুড়োটা মেঘে ঢাকা ছিল, তারই নীচে রাস্তার ধারে এক জায়গায় বসে চা খাওয়া গেল। এই রাস্তা দিয়ে কতবার মোটরে এসেছি—সবই পরিচিত। ঠিক সন্ধ্যায় গিরিডিতে এলুম।

রানী সব গুছিয়ে রেখেছিল—খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লুম। বেশ ঠাণ্ডা ছিল—খুব ঘুম হয়েছিল। রানী আজ সকালে কলকাতায় ফিরে গেল—বুলা আরো দুদিন থেকে যাচ্ছে। বাড়ীটা বেশ ভাল—বিশেষতঃ দোতালায় যেখানে আমরা আছি। সামনে নদী, দূরে পাহাড়, অনেকখানি খোলা। কিন্তু শহরটার পিছন দিকে অনেক বাড়ী হয়ে গেছে—আগেকার মত নেই। আমাদের ভাল লাগছে আর দু-একদিন গেলে বুবার শরীর কিরকম থাকে।

দাদামশায়কে খবর দিও।

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'
১৬-০২-৪০

পুষুমণি,

তুমি যে রকম বড় বড় চিঠি লিখছ তাতে আমারও খুব বড় করে চিঠি লেখা

উচিত। কিন্তু জানোই তো এখানে যখন অথিতির ভিড় হয় কোন কিছু করারই তখন সময় পাওয়া যায় না। আমরা সব সময় চিঠি ভাল করে না লিখতে পারলেও তোমার সময় থাকল তুমি সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো—তোমার চিঠি পেলে আমাদের খুব ভাল লাগে বুঝতেই পারো। অজিতকে বোলো আজ তার মস্ত বড় চিঠি পেয়েছি এবং খুব খুশী হয়েছি। এর উপযুক্ত জবাব দিতে একটু সময় লাগবে। আজ সময় নেই—মহাত্মাজীর জন্য সব ব্যবস্থা করতে বড় ব্যস্ত আছি—পরশু তিনি আসছেন। সঙ্গে অনেক লোক আনবে প্রায় ১৫/২০ জন। ঐ সঙ্গে আবার বিড়লারা আসছেন। আমাদের সব বাড়ী মিলেও লোক ধরবে না। তাই মুস্কিলে পড়েছি। মহাত্মাজীর জন্য যত ছাগল আছে সব জড়ো করতে হচ্ছে। ছাগলের দুধতো চাই-ই, তার উপর ছাগল দুধের ঘি না হোলে তার 'খাকরা' রুটি তৈরী হবে না। এই সময় আবার রানী প্রশান্তরা আসতে চেয়েছিল—তাদের টেলিগ্রাম করে বারণ করা হোলো। মহাত্মাজী ১৯শে চলে যাবেন, এই ক'দিন কোনো সময় পাবো না। চলে গেলে তবে ভাল করে চিঠি লিখব। ছবি দুটো পাঠিয়ে দিয়েছি—আশা করি এই চিঠি পাবার আগেই ছবি পেয়ে যাবে। তোমাদের বিয়ের ছবির ধরমসী যে ফিল্ম তুলেছেন ভাল হয়েছে জেনে খুশী হলুম। বেশ একটা রেকর্ড রইল। অপূর্বর ফিল্মের কপির জন্য তাকে মনে করিয়ে দেবো।

কুকুররা ভাল আছে। এখন আমাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়ে না। বেচারী পার্থোস্ কোলকাতায় আছে। এখন একটু ভাল। কাল সরোজের কুকুরটাকে এনেছিল—সে চমৎকার হয়েছে এখন।

এখানে এখন খুব ঠাণ্ডা চলছে। সবাইকে আমাদের কথা মনে করিয়ে দিও। বোলো আমরা খোঁজ নিচ্ছি। আমার শরীর এখন সেরে উঠেছে।

ইতি

বাবা

Everest Villa
Darjeeling
1942

পুষুমণি,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। বেড়ালটাকে নাথু যদি কিছু করতে না পেরে থাকে তবে ভাবনা নেই—আমি ফিরে গিয়ে ঠিক ধরে দেবো। এক জোড়া

কুকুর নেবার চেষ্টা করছি যদি পাই তো কুকুর থাকলে ভয়ে আর বেড়াল বাড়ী আসবে না।

তোমাদের বৃষ্টি এখানেও এসে পৌঁচেছে। কাল থেকে বেশ মেঘ ও কুয়াশা করে রয়েছে—রাত্রে খুব বৃষ্টি ঝমাঝম হয়েছিল। এইরকম চল্লে দার্জিলিং ছেড়ে আবার পালাতে হবে। কিন্তু যাই কোথায় ? কোথাও বেশি গরম, কোথাও বেশি বৃষ্টি, পালাবার যে আর জায়গা নেই।

ডাক্তার বাবু কাল চলে গেলেন। তোমাদের সঙ্গে বোধহয় দেখা হয়েছে।

ছুটি তো শেষ হয়ে এলো। ইংরেজি ও অঙ্ক ভাল করে রোজ পড়ে রেখো। তাহলে ক্লাসে অসুবিধা হবে না। পূর্ণিমার মানঅভিমান-ঝগড়া কিরকম চলছে ?

তোমার সাইকেল ঠিক হয়েছে জেনে খুশী হলুম।

বাগানের খবর কি ? মালীরা সব ঠিক কাজ করছে ? মায়ের শরীর এখন কিরকম আছে ? আর হাঁপানী হয় ?

ইতি
বাবা

উত্তরায়ণ
রবিবার
০৫-৪-৪২

পুষুমণি,

তোমার শেষ চিঠির জবাব দিতে খুব দেরি হয়ে গেল। বম্বেতে অজিতকে ইতিমধ্যে একটা লিখেছি। তোমাকে রোজই লিখব ভাবি, হয় দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ি নয় তো কোনো কাজ এসে পড়ে আর বাধা সৃষ্টি করে।

আমাদের এ অঞ্চলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছে। আসন্ন বিপদের জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কাগজে পড়ে থাকবে কাল কলকাতায় কয়েকবারই জাপানী উড়োজাহাজ ঘুরে গেছে, এখনো বোমা ফেলে নি, যে কোনো সময় ফেলতে পারে। এরাও রক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা এখন করছে। কলকাতা শহর তো পলটনে ভরে গেছে। বাইরে পূর্ববঙ্গ, আসাম, তারপর আসানসোল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জায়গায় রীতিমত সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থা চলছে। যুদ্ধের কী রকম আয়োজন দরকার হয় তা সাধারণ লোক এখন চাক্ষুষ সব দেখতে—বুঝতে পারছে। তোমরা যেখানে আছ এ সব কিছু উপলব্ধি করতে পারবে না। আশ্রমে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি সব দিক থেকেই। সব

পুরুষদেরই (কৃষ্ণ, অনিল, ক্ষিতীশ, প্রভৃতি কেউই বাদ নেই) রোজ লাঠি নিয়ে drill করতে হচ্ছে। রাত্রে পাহারা দিতে হচ্ছে। মাসোজি fire brigade দল গঠন করছে। ডাক্তারবাবু ছেলেমেয়ে অনেককে নিয়ে first aid শেখাচ্ছেন। ঘরে ঘরে তিনমাসের মত খাওয়া-দাওয়ার জিনিস সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখা হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় আমার পক্ষে আশ্রম ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়—ভয়ানক খারাপ দেখাবে। বিশেষতঃ বিশ্বভারতীর সংসদ একা আমার উপরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার দিয়ে রেখেছে। যতদিন না বিপদের সংকট কেটে যায় ততদিন বাধ্য হয়ে আমাকে এখানে থাকতেই হবে। সেইজন্য পাহাড়ে যাবার মতলব সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয়েছে। দু-একমাসের মধ্যেই বোঝা যাবে কি হয়। যদি ভালয় ভালয় কেটে যায় তবে বর্ষা পড়লেই বা জ্যৈষ্ঠ মাসে পাহাড়ে যাওয়া হোতে পারে। তার আগে তো নয়ই, তখনও সম্ভব হবে কি না সন্দেহ।

তোমাকে সব জানালুম—তার থেকেই বুঝতে পারবে কেন তোমাকে এখানে আসতে বলতে পারছি না, বা পাহাড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারছি না। টাকা সম্বন্ধেও খুব সাবধান হোতে হচ্ছে। যে কোনো সময় জমিদারীতে মুসলমানদের অত্যাচার হোতে পারে, টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। রেল বন্ধ হয়ে গেলে জমিদারীর সাহায্য পাব না। তাই সব দিক থেকেই বিশেষরকম ভাবনা চিন্তার মধ্যে রয়েছি। অজিতকে এসব বিষয় জানিয়ে চিঠি লিখেছি।

আশ্রম বন্ধ হবার সময় হয়ে এলো। ২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) বন্ধ হবে। তার আগে নববর্ষের দিন বাবার জন্মোৎসব করা হবে। তারই আয়োজন চলছে।

আশা করি তুমি ভাল আছ। বর্ধমান থেকে সাবিত্রী তার বাবাকে নিয়ে কাল এসেছিল। জমি নিয়েছে—বাড়ী করতে চায়।

ইতি
বাবা

'উত্তরায়ণ'
০৯-৪-৪২

পুষুমণি,

আমাদের এখানে কাল বিকেলে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেল। ক'দিন ধরেই মেঘলা ও মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি পড়ে—ঠাণ্ডা যাচ্ছিল। কাল হঠাৎ বেলা ৩টার সময় কাল বৈশাখী ঝড় এলো। অনেকক্ষণ ধরে কেবল শুকনো ধুলো ওড়াতে লাগল—এত অন্ধকার যে এবাড়ী ওবাড়ী দেখতে পাওয়া যায় না, আর সমস্ত

আকাশটা ধুলোয় লাল হয়ে গেল। সেই ধুলো ঝাড়তে আজ সমস্ত দিন গেছে। তারপর বৃষ্টিও হয়েছে। এবার প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে এত চমৎকার আবহাওয়া যাচ্ছে, মোটেই গরম পাই নি। এরকম চললে পাহাড়ে যাবার তো কোন দরকারই হবে না।

১লা বৈশাখ এসে পড়ল। সেইদিন বাবার জন্মোৎসবও হবে। প্রতি বছরই ঐদিন করা হবে ঠিক হয়েছে। সমস্ত দিন ধরে কিছু না কিছু প্রোগ্রাম থাকবে—কখনো বাউল—কীর্তন গান। কখনো বাবার লেখা থেকে প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠ। কখনো অভিনয় এইরকম চলবে। কাউকে নেমন্তন্ন হবে না—কিন্তু সকলেই আসতে পারে—যত লোক আসবে তাদের জন্য সাধাসিধে খাওয়া থাকবে। কতকটা মেলার মত হবে। অবশ্য এ বছর বেশি লোক হবে না—কলকাতায় যে রকম লোকে ভয়ে ভয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে একদিনের জন্যেও যেতে পারে না। ট্রেনেও এত ভিড় — যাতায়াত করা খুব অসুবিধা।

কলকাতায় ইতিমধ্যে একদিন জাপানী-উড়োজাহাজ ঘুরে গেছে—তবে বোমা ফেলে নি। এখন যে কোন দিন রীতিমত air raid হোতে পারে। তবে ইংরেজরাও কলকাতায় বিস্তর সৈন্য, অনেক এরোপ্লেন, কামান, প্রভৃতি এনে ফেলেছে। শহরটা এখন যেন একটা miliatry camp বলে মনে হয়। এখানেও আমরা অনেক ট্রেঞ্চ করে রেখেছি। উত্তরায়ণের চারিদিকেই হয়েছে। প্রত্যেকটাই ঘরের মত মাটির ছাদ করে দেওয়া হয়েছে—যাতে বর্ষাকালেও ব্যবহার চলে। আমার ঘর Studio-র নীচে—রীতিমত দুর্গের মত হয়েছে—চারিদিকে বালির বস্তা, মাটির দেয়াল। কিছু হলে এখানে আশ্রয় নেব। দামী জিনিসপত্র সব মাটির তলার ঘরে নাবিয়ে দিয়েছি।

বাবার চিঠিপত্র যত আছে—এখন ছাপাতে আরম্ভ করা হচ্ছে। "পত্রধারা" বলে Series চলবে। অনেকদিন লাগবে সব ছাপাতে। প্রথম বইটাতে আমাদের নিজেদের কাছে লেখা চিঠি বেরোবে—অর্থাৎ আমার মা, আমি, তোমার মা, মীরা প্রভৃতিকে লেখা। তোমার কাছে বাবার লেখা চিঠি কিছু থাকলে তুমি শীঘ্র পাঠিয়ে দিও রেজিস্ট্রিডাকে। সেগুলোও তাহলে বইয়ের ভিতর যাবে।

কেমন আছ ? ওখানে গিয়ে মোটা হচ্ছ ?

ইতি
'বাবা'

পুঃ তোমার জন্য বাংলা বই পাঠাব। আনতে দিয়েছি।

সোমবার
রাজপুর
১৯৫৩

পুষুমণি,

আমি তোমাকে বলব ভেবেছিলুম কিন্তু তোমার শরীর ভাল ছিল না বলে অপেক্ষা করছিলুম। আজ গিরিধারী এসে যে বিষয়ে কথা বলব মনে করেছিলুম সে বিষয়ই উত্থাপন করাতে আমি তোমাকে লিখেই আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

তোমরা যাতে নিজেদের সংসার নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে চালাতে পার তাই জন্য উদীচীতে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কেবল সেই উদ্দেশ্য নয়—মনে ছিল যে আমার অবস্থা এখন খুবই খারাপ, জমিদারী তো গেছে, কোনো রকমে এদিক ওদিক যা পাই তাতে কষ্টে চালাতে হয়, কোনোদিন এমন আসতে পারে যে তোমাদের হয়ত আর্থিক সাহায্য করতেই পারব না। তার জন্য প্রস্তুত হয়ে তোমরা যত শীঘ্র নিজেদের আয়ের মধ্যে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পার ততই ভালো হয়।

এখনকার মত আমি মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে মাসে মাসে ২০০৲ দিতে অন্নদাকে বলে দিয়েছি। আমাদের মনে হয় যদি সাবধানে খরচ কর তবে এই টাকা থেকে তোমাদের দু'জনের সংসার খরচ বেশ চলে যেতে পারে। তুমি নতুন সংসার পেতেছ—তোমার অভিজ্ঞতা তেমন হয়নি—যদি দেখ যে এই টাকার মধ্যে চলছে না—তবে মা যখন থাকবেন না অন্য সময় অন্নদার বা গিরিধারীর পরামর্শ নিতে পার। একসঙ্গে টাকা পেলে অনেক সময় বেশী খরচ হয়ে যায়—তাই যদি বল তবে অন্নদাকে জানাতে পারি যে একসঙ্গে সব টাকাটা না পাঠিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে ৪ ভাগে ৫০৲ টাকা করে তোমার কাছে পাঠাবে। তোমার হয়ত তাতে সুবিধা হবে—তোমার জানা থাকবে এক সপ্তাহ ঐ ৫০৲ টাকায় ম্যানেজ করে নিতে হবে। আমাদের দিক থেকে এই ব্যবস্থা রইল।

গিরিধারীর income থেকে সে তোমার নিজের খুচরা খরচের জন্য Pocket money—হিসাবে মাসে ২৫৲ টাকা দিতে চায়। সেটা তোমার নিজেরই জন্য। আর গিরিধারী নিজের বাজে খরচের জন্য ২৫৲ তার নিজের কাছে রাখবে। বাকী যা clinic-এর আয় হবে আমি বলেছি সে টাকা খরচ না করে ব্যাঙ্কে জমাবে। Practice ভালো করে build up করতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা invest করা দরকার। ব্যাঙ্কে মূলধন না থাকলে কোথা থেকে সে টাকা পাবে ? তাছাড়া

আকস্মিক অনেক সময় টাকার দরকার হয়ে পড়ে যেমন অসুখবিসুখ আছে, কোথাও বেড়াতে যাওয়া আছে, ইত্যাদি। তার জন্য টাকা জমিয়ে রাখা উচিত। কোনো রকমেই অনাবশ্যক বাজে খরচের জন্য এই মূলধনে হাত দিও না। তাহলে বিপদ আপদের সময় মুস্কিলে পড়বে। এখন সংসার-খরচ বাদে অন্য কিছু খরচ করার তোমার প্রয়োজনও হবে না। উদীচীর জন্য যা কিছু দরকার তা ভালো করেই করে দেওয়া হয়েছে। কেবল খাবার, পরবার জন্য ২০০্‌-তে ম্যানেজ করা উচিত। যদি কখনো কোনো অসুবিধা বোধ কর এই ব্যবস্থায় তবে আমাকে বা মাকে জানিও। তবে আমার বিশ্বাস Carefully চল্লে এতেই সচ্ছল ভাবে তোমাদের সংসার চলে যাবে।

তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তবে কোনো নিরিবিলি সময়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।

ইতি
বাবা

'দেরাদুন'
30th March, 1955

পুপুমণি,

তোমাকে অনেক দিন চিঠি লেখা হয় নি। আমি দিল্লী গিয়েছিলুম। এবার পুরান দিল্লীতে Maiden's Hotel-এ ছিলুম। আমার ঐ দিকটাই ভাল লাগে—বেশ Quiet, আর কাছেই 'চাঁদনী-চক'—সেখানে গেলেই পুরান ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যায়। এবারেও কিন্তু ওখানে গিয়ে আমার শরীর ভাল ছিল না। বোধহয় ১৫০ মাইল মোটরের ঝাঁকুনি ঠিক সহ্য হচ্ছে না। বুড়ীকে দেখে খুব খারাপ লাগল। এত বিশ্রী ও রোগা চেহারা কখনো দেখিনি। তবে বললে শরীর এখন অনেকটা ভাল হয়েছে— আবার কাজ করছে। দিল্লী থেকে ফেরার সময় সাহারানপুরে টুনুদের বাড়ীতে দুপুরের বেলাটা কাটালুম। সুশীলা রেঁধে খাইয়েছিল। আর কিছু না হোক—রাঁধতে পারে ভাল। তারপর সেখান থেকে দেরাদুনের মধ্যে এক জায়গায় হঠাৎ গাড়ী গেল ভেঙে। পিছনের চাকা Axle সমেত বেরিয়ে এল। ড্রাইভারটা খুব মাথা ঠাণ্ডা লোক—একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গাড়ী থামিয়ে দিল—যদিও খুব ঝাঁকানি লাগল—কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলুম। গাড়ীটা সেখানেই রইল—Bus-এ ফিরে এলুম। তারপর দিন মিস্ত্রী পাঠিয়ে মেরামত করিয়ে গাড়ী আনিয়ে নিই। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

দোলের দিন টুনুরা সবাই সুপূর্ণাকে নিয়ে এখানে এসে ২/৩ দিন কাটিয়ে গেল। বীরুরাও একদিন এসেছিল। বেশ জমেছিল। এখন আবার সব চুপচাপ। বেশ গরম পড়ে গেছে। তবে রাতটা এখনো ঠাণ্ডা—কম্বল গায়ে দিতে হয়।

তোমাদের খবর দিও। সুনন্দন কি করছে। এখন কি লোক চিনতে পারে?

ইতি

'বাবা'

পুঃ তোমার বাড়ীর সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনে গিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করব। এখান থেকে কিছু করা সম্ভব নয়।

বাবার বাল্যস্মৃতি

কলকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীটা যেন একটা প্রাচীন বটগাছ, প্রচুর ডালপালা ছড়িয়ে বেশ কয়েক বিঘা জমি অধিকার করে রয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে বাড়ীটাকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। কি করেই বা তা হবে, কলকাতা শহর তো হ'ল হাল আমলের, ইংরেজের হাতে তার ভিত্তিপাত। ইংরেজ বণিকরা তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্য গঙ্গার উপকূলে যখন কলকাতার শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করল, আমার পূর্বপুরুষেরা সেই সময়টাতে জোড়াসাঁকোর ধারে আমাদের বাড়ী তৈরী করলেন। ঐতিহাসিক প্রাচীনতার দাবী করতে না পারলেও এই বাড়ীতে আমাদের বংশের সাত-আট পুরুষ বাস করে গেছেন। ঠিক ভগ্নাবস্থা না হলেও বাড়ীটাকে জরায় যে ধরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইঁট-পাথরের অবস্থা যেমনই হোক, এই বাড়ীর সঙ্গে যে জীবনধারা শতাধিক বর্ষ ধরে জড়িত ছিল তার চিহ্ন সেখানে আর পাওয়া যায় না। বাড়ীটা এখনও–দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সারশূন্য নিষ্প্রভ কঙ্কালের মতো—প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে আর, হাসির ধ্বনি কোথাও নেই, গান শোনা যায় না ঘরে ঘরে, ভাবে বিভোর হয়ে কেউ সে বাড়ীর ছাদে বারান্দায় আর ঘুরে বেড়ায় না।

এই বাড়ীরই কোন এক ঘরে আমি জন্মেছিলুম। আমার মনে হয় শুভক্ষণেই আমার জন্ম হয়েছিল। বাড়ীর ঐশ্বর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান। আমার পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন বাড়ীর কর্তা। তাঁর সাত ছেলের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আমার জাঠতুতো ভাইবোনের মধ্যেআমিও সর্বকনিষ্ঠ হয়ে জন্মালুম। আমার আগে বাড়ীতে অনেক ছেলেমেয়ে জন্মেছে, আমার জন্ম সেইজন্য বিশেষ একটা ঘটনা বলে পরিগণিত নিশ্চয়ই

হয়নি। তবে আত্মীয়স্বজনের মহলে 'রবিকাকা' সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাই শিশু অবস্থায় আমারও একটু খাতির যে হয়নি তা নয়। তার নিদর্শন পেলুম কিছুদিন আগে 'পারিবারিক খাতায়'। আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে আই· সি· এস· হয়ে ফেরবার পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে না থেকে থাকতেন বালিগঞ্জে। সেখানে তাঁর বাড়ীতে আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রত্যহ একত্র হতেন বিকালবেলায়। খেলাধূলা, গানবাজনা, আলাপ আলোচনা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। যে ঘরে আড্ডা বসত সেখানে রাখা থাকতো মোটা গোছের একটা বাঁধানো খাতা। যখন যার খেয়াল যেতো, যেমন খুশি তাতে লিখে রাখতেন। এরই নাম ছিল 'পারিবারিক খাতা'। তার পাতা ওলটালে দেখা যায় হালকা রকমের হাসির কথা, মজার কবিতা, নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ চুটকি প্রবন্ধ কত কি যে ভালমন্দ খেয়াল মত লেখা তার পাতায় পাতায় আছে, যা পড়লে বেশ কৌতুক বোধ হয়। এই খাতাটি কয়েক বছর আগে আমার কাছে আসে। পড়তে গিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল ১৮৮৮ সালে লেখা আমার দাদা হিতেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের দুটি ছোট মন্তব্য। মন্তব্য দুটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। আশা করছি আমার পরলোকগত দাদারা আমাকে ক্ষমা করবেন। তাঁদের নিষেধ ছিল এই খাতার কোন লেখা প্রকাশ করা।

'রবিকাকার সন্তান'

নভেম্বর ১৮৮৮

রবিকাকার একটি মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না, রবিকাকা অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে।

প্রথম পার্ক স্ট্রিটের বাড়ীতে লিখিত।

March 1890 — শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিদ্‌দা, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও এখন চাক্ষুষ। প্রকৃতিটা গম্ভীর যা'......তা' অস্বীকার করার যো নেই। তবে কিনা সামাজিক জীব না হয়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তাও মনে হয় না। আর গম্ভীর হয়েছে বলে যে হাসবে না তা নয়। রবিকাকারও প্রকৃতি আসলে যদি (ধর গম্ভীর । গম্ভীর ও গোমরায় তফাৎ আছে। হাসলেই যে গাম্ভীর্য্য মারা যায় এমনও বোধ হয় না। আসল কথাগভীরে (তা) সেটা আবশ্যক—হাসি মানে সারাক্ষণ দাঁত বের করে থাকা না।

B. T. (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এতেও শেষ হল না, মন্তব্য আরো চলল···

March 1890

বোলদা, এক হিসেবে হিদ্‌দা ঠিক বলেছেন। খোকা যোগ করুক আর না করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে।

সরলা (সরলা দেবী চৌধুরাণী)

খোকা বেচারা যোগই করুক আর গোলযোগই করুক, জন্মাবার আগে থেকে তার উপর যে রকম সমালোচনা চলেছে তাতে তার পক্ষে কতদূর সুবিধের বলতে পারিনে। বড় হলে সে বেচারীর না জানি আরও কত সইতে হবে······কিন্তু তখন হয়ত প্রতিবাদ করতে শিখবে—এ রকম নীরবে সহ্য করবে না। রাম না হতে যে রামায়ণ হয়েছিল যে বিষয়ে বাল্মীকি (কৃত্তিবাস দেখবার আবশ্যক নেই)—হাতে কলমে প্রমাণ এইখেনেই। আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা (হত এখন হয়) জন্মাবার আগে।

B. T. (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমার দাদাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী কতটা ফলবতী হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিৎ নয়—তবে এইটুকু বলতে পারি, দাদা হিতেন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সত্ত্বেও ধ্যান ধারণায় আমার জীবন অতিবাহিত হয়নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিবার তখন বৃহৎ ছিল। বাড়ীটা মস্ত বড়, তবু সকলকে ধরত না। ······ছেলেবেলায় আমরা এই হাটের মধ্যে মানুষ হয়েছি। আমাদের দেশে যতদিন একান্নবর্তী পরিবারের রেওয়াজ ছিল, একত্রে বাস করার অনেক সুবিধা সত্ত্বেও একটা অসুবিধা ছিল, আমি ভুক্তভোগী বলে উল্লেখ করছি। আমার ভাই বোনেরা সকলেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য, সুস্থ সুন্দর তাঁদের চেহারা। আমার সহোদরা ভগ্নীর রঙ যেমন ফরসা, চেহারাও অপরূপ সুন্দর ছিল। বাড়ীর মধ্যে আমারই রঙ কালো। চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অত্যন্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে হীনমন্যতা তা যেন ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড়ো হয়েও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না। একান্নবর্তী পরিবারে এই অসুবিধা—যাদের কোনো দুর্বলতা আছে, যাদের দেহমন বলিষ্ঠ না তাদের বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমার যখন সাত আট বছর বয়স, কয়েক মাসের জন্য পিতা আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে খোলা মাঠে, নদীর চরে রোদবৃষ্টিতে ঘুরে বেড়িয়ে শরীরের উন্নতি খুব হল বটে, তবে গায়ের রঙ আরও এক পোঁচ কালো হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে এসে যখন গগনদাদাদের বাড়ীতে জেঠাইমাকে প্রণাম করতে গেলুম, তিনি আমার মুখ ধরে বললেন, 'ছিঃ', রবি তাঁর ছেলেকে একেবারে চাষা বানিয়ে নিয়ে এলেন। সেই কথা শুনে আমি ঐ বাড়ী যাওয়া ছেড়েই দিলুম।

পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রভাব পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। অথচ তিনি থাকতেন না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটের এক ভাড়াবাড়ীতে।

আমরা ছোটরা বিশেষ কয়েকটা দিনে তাঁর কাছে যেতে পেতুম। সাতই পৌষ, এগারই মাঘ, নববর্ষ ও মহর্ষির জন্মদিবস তেসরা জ্যৈষ্ঠ্যতে যেতুম তাঁকে প্রণাম করতে। তাঁর ঘরে ঢুকতে আমাদের কী ভয় করত এখনও মনে পড়ে। কিন্তু পায়ের ধুলো নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখে যে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত তা দেখে সব ভয় কোথায় চলে যেত। খুব ভাল লাগত যখন দেখতুম আমাদের মত ছোট ছেলেমেয়েদেরও সকলের নাম তাঁর মনে আছে। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে যখন বেরিয়ে আসতুম মনে হত যেন নূতন জন্মলাভ করলুম।

বাবার শিল্পকৃতির বিবরণ

FLOWER STUDY

1)	Nagkeshar	:	Water-Colour
2)	Magnolia	:	,,
3)	Hollyhock	:	,,
4)	Thunder Lily	:	,,
5)	Kanchan flower	:	,,
6)	Pahari Jhumka (Passion flower)	:	,,
7)	Flower Study	:	,,
8)	Flower Study	:	,,
9)	Fuschia	:	,,
10)	Hill flower	:	,,
11)	Poinsettia	:	,,
12)	Kanchan flower	:	,,
13)	White flowers	:	,,
14)	Canna	:	,,
15)	Gladialii	:	,,
16)	Flower Study	:	,,
17)	Flower Study	:	,,
18)	Lily	:	,,
19)	Flower in vase	:	,,
20)	Flower Study	:	,,
21)	Kanchan flower	:	,,
22)	Kanchan flower	:	,,
23)	Bignonia	:	,,

24) Lilies in vase : ,,
25) A branch of a flower tree : ,,
26) A sketch of a tree : ,,
27) Dead tree : ,,
28) Flower Study : ,,
29) Jhumko (Passion flower) : ,,
30) Lilies in Vase : ,,
31) Palash in bloom : ,,
32) Magnolia : ,,
33) Madar in bloom : ,,
34) Jakaranda in bloom : ,,
35) Roses : ,,

LANDSCAPE

36) River side : ,,
37) Autumn hues : ,,
38) Evening sky : ,,
39) Hill View : ,,
40) Landscape : ,,
41) Hill View : ,,
42) Cluster of trees : ,,
43) The blue mountains : ,,
44) Hill path : ,,
45) Garden view : ,,
46) Terrace cultivation : ,,
47) Mountain clouds : ,,
48) Hills & Valley : ,,
49) Trees against night sky : ,,
50) Hill view against morning sky : ,,
51) Hill view : ,,
52) Glen : ,,
53) Snow View : ,,
54) Village Scene during monsoon : ,,
55) A man on boat : ,,

MASK

56) Water-Colour : ,,

WOOD WORK AND LEATHER CRAFT-CASKETS AND CONTAINERS WITH ARCHITECTURAL FORM

1) Square Casket inlaid with Rosewood.

2) Box in architectural form of walnut wood.
3) Box in architectural form of gambhar wood inlaid with rose wood.
4) Temple shaped casket of gambhar wood inlaid rose wood.
5) Oblong box of gambhar wood with rose wood base and inlay.
6) Model for an Urn of gambhar wood inlaid with ebony.
7) Octagonal powder box of gambhar wood inlaid with ebony.
8) Octagonal powder box of gambhar wood inlaid with rose wood.
9) Square Powder box in architectural design of gambhar wood and rose wood.
10) Powder box in the model of a thatched Cottage.
11) Powder box in the model of a cottage.
12) Model of a temple of gambhar wood.
13) Gambhar wood box with rosewood inlay.
14) Model for an Urn of gambhar wood with rose wood inlay.
15) Model for an Urn of gambhar wood with rose wood inlay.
16) Model for an Urn in polished wood with rose wood and brass inlay.
17) Model for an Urn of gambhar wood and rose wood.
18) Casket in cubistic design of gambhar wood and rose wood.

TRINKET BOXES AND CASKETS OF VARIOUS UTILITY

19) Miniature cigarette and match box cabinet with rolling shutters.
20) Round topped rose wood jewel box with ivory inlay.
21) Rose wood folding jewel box with silver plate decoration and various compartments.
22) Rose wood cigarette box inlaid with gambhar wood.
23) Gambhar wood cigar box inlaid with rose wood.
24) Rose wood and gambhar wood cigarette box.
25) Casket of gambhar wood with rose wood inlay work.

26) Gambhar wood and rose wood Cigarette box.
27) Gambhar wood casket with rose wood base and handle.
28) Gambhar wood Cigarette box with rose wood inlay.
29) Gambhar wood box with rose wood inlay.
30) Wooden Casket with rose wood base.
31) Small gambhar wood casket with ivory and ebony inlay.
32) Small gambhar wood box with inlay of rose wood.
33) With inlay of red wood Octagonal powder box of gambhar wood inlaid with rose wood.
34) Small Octagonal powder box of gambhar wood with poker work and rose wood knob.
35) Square powder box of gambhar wood with rose wood inlay.
36) Small box of gambhar wood with ebony inlay.
37) Octagonal powder box stained and varnished.
38) Small Square box with black knob inlaid with brass.
39) Small polished square box with Octagonal lid of gambhar wood with rose wood inlay.
40) Small powder box of polished wood with rose wood base and knob.
41) A trinket box in the shape of a Brazil nut.

CIGARETTE CASES

42) Walnut wood cigarette case with rose wood lid.
43) Gambhar wood cigarette case with rose wood inlay.
44) Gambhar wood cigarette case with rose wood inlay
45) Combined cigarette and match box case of gambhar wood.
46) Gambhar wood cigarette case with sliding lid.
47) Combined cigarette and match box case of gambhar wood.
48) Combined cigarette and match box case of gambhar wood.
49) Gambhar wood cigarette case.
50) Gambhar wood cigarette case with rose wood inlay.
51) Combined cigarette and match box case of gambhar wood with rose wood sliding lid..

52) Combined cigarette and match box case of walnut wood.
53) Rose wood cigarette case with arrangement for lifting cigarette

ARTICLES MADE FROM A SINGLE BLOCK OF WOOD

54) Walnut box for keeping visiting cards.
55) Walnut box with hinged lid and rosewood inlay (architectural form).
56) Rosewood salt celler inlaid with gambhar wood (architectural form).
57) Box in architectural design for keeping visiting cards.
58) Walnut wood box in architectural form with rose wood knob.
59) Square rosewood box with hinged lid of engraved lacquar design.
60) Rosewood model for an Urn.
61) Rosewood model for an Urn.
62) Rosewood model for an Urn (architectural form).
63) Rosewood box in architectural form with hinged lid decorated with red knob.
64) Square walnut box with rosewood knob.
65) Rosewood model for an Urn with hinged lid and inlay of ebony.
66) Rosewood model for an Urn.
67) Gambhar wood visiting card box with lacquar design in relief.

CASKETS WITH PICTORIAL INLAY

68) Jewel box with design of a pair of birds in wood of different colour.
69) Box in gambhar wood with dancing figure inlaid in wood of different colour
70) Jewel Boox with design of mother and Child inlaid in wood of different colour.
71) Box of gambharwood and rosewood base with figure of man and woman inlaid in wood of various colour.

ARTICLES KEEPING THE NATURAL FORM OF WOOD

72) Ash-Tray on a Standard.
73) Tobacco Container with Lid sliding on a Pivot.
74) Combined Cigarette Box and Ash-tray
75) Cigarette Box.

ARTICLES DISPLAYING NATURAL GRAIN OF WOOD

76) Small Tray of Pine tree burr.
77) Jewel Box inlaid woth Palmwood

78) Marble wood Cigarette case
79) Marble wood Cigarette Case
80) Cigarette box made of marble wood.

CASKETS WITH CARVING IN BAS RELIEF

81) Rosewood Cigarette Box with arrangement for Lifting cigarette
82) Walnut and rosewood Cigarette Box with hinged Chambers.
83) Cigarette Box with Panels of Copper engraved in bas relief.
84) Gambhar wood Cigarette box with panels of rosewood carved in basrelief

ARTICLES OF WOOD WITH DESIGNS PAINTED ON THEM

85) Round Powder Box with design in Colour.
86) Rectangular visiting-card box of Gambhar wood inlaid with rosewood and with design in Colour.
87) Square Powder Box with flower design.
88) Small wooden tray with 'Batik' design.
89) Portable folding tray with Painted design.
90) Oval shaped tray with Alpana design.
91) Card-Box with Painted design.

ARTICLES OF WOOD TURNED ON LATHE

92) Polished gambhar wood powder box with rosewood base and knob.
93) Walnut powder box with rosewood inlay.
94) Walnut powder box with rosewood inlay.

95) Urn shaped powder box with rosewood inlay and knob.
96) Cigarette box of polished wood with rosewood inlay.

MISCELLANEOUS ARTICLES OF VARIOUS USE

97) Pen stand of gambhar wood with rosewood base and handle.
98) Pen stand of gambhar wood with rosewood base and handle.
99) Toilet paper holder
100) Portable chess box.
101) Salt & pepper cellar stand made of rosewood.
102) Pepper Cellar made of gambhar wood.
103) Salt and made of gambhar wood.
104) Salt and pepper cellar stand.
105) Pepper cellar of gambhar wood with rosewood base.
106) Salt cellar of gambhar wood with rosewood inlay (unfinished).
107) Salt celler of gambhar wood with inlay in ebony (unfinished)
108) Toast rack made of gambhar wood and rosewoood.
109) Toast rack made of gambhar wood and rosewood.
110) Toast rack made of gambhar wood and rosewood.
111) Folding photograph case.
112) Folding photograph case made of rosewood.
113) Pen stand made of rosewood inlaid with gambhar wood.
114) Box for keeping twine-thread.
115) Box for keeping twine-thread.
116) Menu card holder made of rosewood.
117) Menu card holder made of gambhar wood
118) Model of a cabinet.
119) Model of a cot.
120) Wood block for textile design.
121) Smoking pipe made of rosewood inlaid with gambhar wood.
122) Toy boat for Lily pond.

ELECTRIC LAMPS

123) Table lamp of architectural pattern made of gambhar wood and rosewood inlaid with ebony.
124) Wooden table lamp with painted design
125) Standard lamp of giant bamboo and natural bamboo roots.
126) Standard bed side lamp of teek wood with rosewood inlay.

STUDIES IN WOOD INLAY WORK

127) Landscape
128) Landscape
129) Landscape
130) Human figure
131) Human figure
132) Human figure
133) Human figure
134) Human figure
135) Flowers
136) Mother & Child
137) Birds
138) Bird
139) Bird

LEATHER CRAFT

140) Book Cover
141) Album Cover
142) Album Cover*
143) Writing Pad
144) Writing Pad
145) Letter portfolio
146) Book mark
147) Leather Scroll of a design after Rabindranath's painting
148) Leather scroll of a design after Rabindranath's painting

বাবার সাহিত্য রচনা ও শেষ জীবন

বাবার সাহিত্য রচনা

আমার বাবার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'ছন্নছাড়া' হয়তো প্রথম রচনাও। প্রকাশ বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৪৪।

'পুরুষের মন' নামে একটি কবিতা রচিত হয়েছে ২৭শে জুন, ১৯৩৭, ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৪। ১৩৪৪-এর চৈত্রে রচিত হয়েছে দুটি কবিতা। একটি 'শেষদান' প্রকাশিত হয়েছে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ প্রবাসীতে। অন্যটি 'কালোদীঘি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৫-এ প্রকাশিত। 'বাঙালী মেয়ে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪৮এ।

উপরোক্ত প্রকাশিত কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ৫-৭-৩৮ এ রচিত নামহীন একটি কবিতা ও 'বাচ্চু' নামে রচনার তারিখহীন একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি রয়েছে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায়। মনে হয় এই দুটি কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বাবার এই সাতটি কবিতা সম্ভবত এই কয়েক বছরের ফসল। তাঁর কবিতার বিষয় মানুষ ও প্রকৃতি। মানুষের জীবনের দুঃখ বেদনা ও পাওয়া না পাওয়া তাঁর স্নেহশীল স্বভাবকে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

এছাড়া তাঁর গল্প 'বাঁধাঘাট' রচনার তারিখ ১৩৪৩। প্রকাশিত হয়েছে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বিচিত্রা।

'এক ভাল্লুকের গল্প' প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সন্দেশ পত্রিকায়।

'স্নানযাত্রা' পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায়।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ১ম ও ২য় খণ্ড (বঙ্গানুবাদ) ১৩৫১ সাল।

আমার বাবা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। বিজ্ঞান

বিষয়ক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুটি গ্রন্থই উচ্চ প্রশংসিত। ১) 'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮), ২) 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২)।

আপন জীবন স্মৃতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ইংরেজী ভাষায়। নাম On the Edges of Time। পরে 'পিতৃস্মৃতি' নামে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৩৭৩)।

ইংরেজী ভাষায় বাবার যথেষ্ট দখল ছিল। লেখার কাজে অধিকতর অধ্যবসায় এবং অভিনিবেশ থাকলে লেখক হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যে এবং ইংরেজীতে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে পারতেন। কিন্তু সর্বদাই বহুবিধ কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। বোধকরি সেজন্যে সাহিত্য কর্মে তিনি যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি। এছাড়া তাঁর নিরতিশয় লাজুক স্বভাবও এ ব্যাপারে খানিকটা অন্তরায় ঘটিয়েছে।

বাবার শেষ জীবন

শান্তিনিকেতনের কাজকর্ম ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় দাদামশায়ের নির্দেশে ১৯১৮ সালে বাবা শান্তিনিকেতনে এলেন ও শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার ভার অনেকখানি নিজের হাতে নিলেন। ১৯২১ সালে প্রধান কর্মসচিবের দায়দায়িত্ব নেন। ১৯২১ সাল হতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই একটানা ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে শান্তিনিকেতনের এবং বিশ্বভারতীর সমস্ত রকম কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে অনেকেই তাঁকে সহায়তা করেন তবে বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ কর মশায় ও অনিল চন্দ মশায়ের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তখন বাবাই বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্বে খুবই ঘরোয়াভাবে বাড়ীর কাজকর্মের মত স্বাধীনভাবে একাগ্র চিত্তে কাজ করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নানা রকম আইনের বেড়াজালে তিনি কাজকর্মে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পূর্বের মত কাজে তিনি আর তেমন আনন্দ পান না। উৎসাহ যেন ক্রমেই কমে আসে এবং তাঁর মনে হতে লাগল এটা চাকুরী ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। চাকুরী জীবনে তিনি কখনই করেননি। বছর দুয়েক মাত্র তিনি এই দায়দায়িত্ব চালান ও ১৯৫৩ সালে তাঁর দায়িত্ব হতে অবসর নেন। তারপর বাবা দেরাদুনে চলে যান। তবে মাঝে মাঝে প্রায় এখানে আসতেন ও শান্তিনিকেতনের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁর

সব সময় দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সময়ও তিনি এখানে এসেছিলেন। তার কিছু পরেই ১৯৬১ সালে ৩রা জুন দেরাদুনে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাবার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। তাঁর জীবন অবসানের সঙ্গে আমি যে কতখানি অসহায় বোধ করেছি এবং এখনও করছি সে কথা বলে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই।এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে শুধু তাঁর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা এবং ভক্তি প্রকাশের অক্ষম চেষ্টা করেছি।

বাবার সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কিছু লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তিতে রচিত)

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি ; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে,
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজনের পাত্রে রাখনি ভোজের আয়োজন,
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্রদেবতারূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।
সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।
তোমার সকল চিত্তে,

সব বিত্তে.
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
তার লাগি যশ নাহি পেলে।
কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।
মানবের ইতিহাসে
যে সকল খ্যাত নাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নি শিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগলভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠদান নিভৃতে নীরব বিধাতার।
মন্দগতি গেছে কত দিন
মন্থর দৈন্যের ভারে কৃচ্ছ্রশীর্ণ বিশ্রামবিহীন।
ভাগ্যের করুণা কাজ করে
নির্মম ঔদাস্যবশে আকাঙ্ক্ষার দূর অগোচরে
বিধাতার প্রত্যাশিত বর
প্রতিক্ষণে সেবা চাহে দেয় শুধু সন্দিগ্ধ উত্তর।
সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশ যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সংকেতে।
অবশেষে অঙ্কুরের দেখা মেলে কৃষিদীর্ণ ক্ষেতে,
প্রসন্ন অঘ্রাণে
সোনার আশ্বাস লাগে ধানে।
প্রৌঢ় সেই শরতের ফসল, দিনের জয়ধ্বনি
অন্তর আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হোতে
আনন্দের স্রোতে।

সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায় প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র 'পরে।

অমিয় চক্রবর্তী

রথীবাবুর কথা ভাবলেই মনে পড়ে তাঁর জন্মগত শিল্পস্বভাব। উত্তরায়ণের সংলগ্ন বাগানে, বাগানবাড়ীতে, কাঁকর ছড়ানো আয়তনের মধ্যবর্তী বিচিত্র গাছের চয়নে এবং পরিচর্যায় সর্বত্র তাঁর রুচি ও নিরলস কর্মনিষ্ঠতার পরিচয় রয়ে গেছে। নতুন যাঁরা আসেন অনেকেই জানেন না তাঁর বৃক্ষপ্রীতির কথা, তাঁর শিল্পঘন সৃজনের শক্তি উত্তরায়ণের কয়েকটি সুন্দর বাড়ী নির্মাণের এবং গৃহসজ্জায় আশ্চর্য প্রকাশিত হয়ে আছে। গৃহনির্মাণের প্রেরণা আসত তাঁর পিতার কাছ থেকে, সাহচর্য পেতেন বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের অভিজ্ঞ স্থাপত্য এবং চিত্রবিদ্যার অনুপ্রেরণায়, তাঁর সমগ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞান, সৌন্দর্য সৃষ্টি একটি সর্বাঙ্গীণ সুষমায় ধরা দিত। তাঁর বেশে সৌজন্যে পরিমিত ভাষণে তিনি শান্ত. দৃঢ় ব্যবহারের ঐশ্বর্য বিতরণ করে গেছেন।

নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের জানা আছে সুষমা কেবলমাত্র অলংকারিত নয়, তার উৎস জীবনের অন্তরতম লোকে। সেই উৎসের সন্ধান পাই রথীন্দ্রনাথের নিজের হাতের ছবিতে, তাঁর গদ্যগ্রন্থে, তাঁর স্বল্প অথচ সুন্দর উদ্ভাবিত কয়েকটি কবিতায়। বিচিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর সহজ পরিচয় ছিল, বহুবার গিয়েছিলেন য়ুরোপে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার চর্চার জন্যে কয়েক বৎসর তিনি ছিলেন। আর্ট গ্যালারি, ম্যুজিয়ম, প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। শান্তিনিকেতনে বহুধা শিল্প প্রকাশের ইতিহাস তাঁর সঙ্গে পর্যায়ে পর্যায়ে জড়িত।

কর্মপদ্ধতি এবং বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বিশ্বভারতী সংগঠনে নিয়োজিত হয়েছে, বিনা পারিশ্রমিকে এবং সেবার আনন্দে তিনি নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন। তা না হলে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে উঠত না। পিতার সাধনাকে তিনি নিজের সাধনারূপে গ্রহণ করে দশকে দশকে অক্লান্তি পরিশ্রম করেছেন। ভ্রমণের আয়োজনে, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল আশ্রমিক এবং ব্যক্তিগতভাবে কবির ইচ্ছা ও প্রেরণাকে তিনি সুচিন্তিত ব্যবস্থায় পরিণত করতেন। তাঁর আত্মোৎসর্গ এবং অভাবিত অকুণ্ঠ ত্যাগের কথা ইতিহাসের

অগোচরে রয়ে গেল।

আবার তাঁর নিজস্ব শিল্পোদ্ভাবনার কথা বলে এই ক্ষুদ্র নিবেদনটি শেষ করি। উড্‌ব্রুব কলেজে, বার্মিংহামে আমি, হৈমন্তী এবং সেমন্তী কিছুকাল ছিলাম। সেখানে যোগ দিলেনরথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী। রথীবাবু ক্লান্ত ছিলেন কিন্তু অপ্রতিহত উদ্যমে তিনি 'চামড়ার শৈল্পকাজ' শুরু করলেন। যন্ত্রপাতি, নানারকম মসৃণ, বহুবর্ণের চামড়া ব্যবহার করে তিনি ব্যাগ, বাক্স, থলি, বই বাঁধার শিল্প উদ্ভাবন করলেন তা বলা যায় না। তাঁরই প্রবর্তনায় চামড়ার উপরে শিল্পকাজ শ্রীনিকেতনে, সমগ্র বাংলায় এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের শিল্পাগারে এবং ব্যবসায়ে ছড়িয়ে পড়ল। চামড়াকে রঙ করে, দৃঢ় বা নরম রূপ দিয়ে তিনি ব্যবহারিক শিল্পের একটি নূতন অধ্যায় রচনা করলেন, কোন লোভ-লোকসানের কথা না মনে করে। যাঁদের এসব বিষয়ে উৎসাহ আছে তাঁরা শুধু শিল্পকাজ দেখে তৃপ্ত হবেন না, যে শিল্পীর উদ্ভাবনায় সুন্দর চিত্রাঙ্কন, গৃহনির্মাণ, উদ্যান রচনা সরস গদ্য এবং কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অন্তর্নিহিত চরিত্র এবং কর্মনিষ্ঠতার মুলে তাঁরা প্রবেশ করবেন। রথীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান কিন্তু তাঁকে জানতে হবে তাঁরি বিশেষ ব্যক্তিত্বরূপের মধ্য দিয়ে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(রথীন্দ্র স্মৃতি)

১৯১৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হলে, রথীন্দ্রনাথ এসে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নিলেন—১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব তাঁর অব্যাহত ছিল। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা লাভ করে বিশ্বভারতী, রথীন্দ্রনাথ তার প্রথম ভাইস-চ্যানসেলার।

রথীন্দ্রনাথের মনটা ছিল শিল্পীর, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈজ্ঞানিকের। উত্তরায়ণের অট্টালিকা, উদ্যান রচনায় শিল্পী রথীন্দ্রনাথকে চেনা যায়। আর গুহাঘরের যাবার পথে যে লতাবিতানের সমারোহ, সেখানে আম, সপেটা, পেয়ারা গাছকে লতানে করার যে প্রচেষ্টা সেখানে বিজ্ঞানী রথীন্দ্রনাথকে চিনতে কষ্ট হয় না।

উত্তরায়ণের উদ্যান রচনা করার পিছনে ছিল তাঁর শিল্পী মনের দরদ ও যত্ন। সেখানে কত গাছ তিনি লাগিয়েছেন। বাগানের মাঝে ছোট হ্রদ, তার চারপাশে রাস্তা তারপর লতা বিতান, সুরভীকুঞ্জ। বাড়ীর বাইরের দিকে তাঁর গোলাপ বাগানে, কত দেশের যে গোলাপ ছিল তা বলে শেষ করা যায় না, তাদের নানা

রূপ, নানা গন্ধ।

রথীন্দ্রনাথের কারুশিল্প ছিল অনবদ্য। কাঠের উপর তাঁর যে শিল্পকর্ম তার কোন তুলনা হয় না। চিত্রাঙ্কনে তিনি পটু ছিলেন। বিশেষ করে ফুলের ছবি আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

রথীন্দ্রনাথের একমাত্র ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে গড়বেন তাঁর ইচ্ছামত সুন্দর করে। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয়নি। উত্তরায়ণের অট্টালিকা ও তার পরিবেশ রচনায় তাঁর শিল্পী সত্তারই পরিচয়। উত্তরায়ণের বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে রূপ থেকে রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন।

রথীন্দ্র তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর পিতার পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহে নিয়োজিত করেন। কবির বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন যাঁরা তাঁর চিঠিপত্র বা অন্য পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে থেকে তিনি সেগুলি নানাভাবে সংগ্রহ করেন। তাঁর চেষ্টাতেই পরবর্তীকালে কবির চিঠিপত্রের কপি করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাছাড়া তাঁর নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনা কপি হয়ে প্রেসে যেতে আরম্ভ করে। যার ফলে বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং আজ বিচিত্র গবেষণার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার যৌবনকালের কথা মনে আছে, তখন যেখানে যা কিছু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বের হত, রথীন্দ্রনাথ সেগুলি সংগ্রহ করে রেখে দিতেন। সেগুলি গ্রন্থাগারে রাখা ছিল বলে রবীন্দ্রজীবনী আমার পক্ষে লেখা সহজ হয়েছে।

পিতার পরলোকগমনের পর নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার স্মরণে রবীন্দ্রভবন তৈরী করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সে উদ্যম তাঁর সফলও হয়েছিল। তাঁর সারাজীবনের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, ফটো, চিঠিপত্র, চিত্র তিনি এখানে দান করে গেছেন। তার পরে অবশ্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও অন্যান্য অনেকেই পাণ্ডুলিপি, চিত্র ইত্যাদি দান করেন।

ভবিষ্যতে যদি একদিন রবীন্দ্রভবন, রবীন্দ্রজীবনীর ও রবীন্দ্র সাহিত্যের তাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্র হয়—তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এর মূলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রভবনের সার্থকতাতেই পরোক্ষে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা হবে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের বংশধারা লুপ্ত হল : অনেকের কাছে এই কথাই বিশেষভাবে শোকাবহ বলে বোধ হয়েছে ; কিন্তু পরবর্তী কালের

স্মৃতির'পরে নিজ গুণেও তাঁর কিছু দাবী ছিল সে কথা একরকম নেপথ্যেই রয়ে গেল। বস্তুত তিনি নিজেই, চেষ্টা করে নয় স্বভাববশেই, যে আত্ম-আবরণের পথে সারাজীবন চলে ছিলেন তা তাঁর স্বীয় কৃতিত্ব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবার পথ নয়। পিতার জীবনব্রতের যথাসাধ্য আনুকূল্যের চেষ্টাকে তিনি সর্বদা নির্ভুল বিচারেই করতে পেরেছেন এমন কথা বলা চলে না, কার সম্বন্ধেই বা সে কথা বলা যায়—কিন্তু সেই কাজ তিনি যে তাঁর অবসর ও চিন্তা একরকম সম্পূর্ণই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ছাত্রজীবনের অবসানকাল থেকে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ভাষা ব্যবহারে তাঁর যতটুকু অধিকার ছিল তার সম্পূর্ণ চর্চা করবার অবসর তিনি হাতে রাখেননি, শিল্পকারুর যে চর্চা করেছেন তা নিরহংকারভাবে লোকলোচনের অন্তরালেই করেছেন। ফলে এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে, বর্তমানে এ দেশে যে সব শিল্পকারু প্রচলিত তার কোন কোনটির প্রবর্তক তিনিই, যে শিল্পবোধ বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা শ্রীনিকেতনের বিবিধ কারু পণ্যের সুষমা ও বৈচিত্র্য সাধনে, শান্তিনিকেতনের শ্রীবিধানে নিয়োজিত হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর দান কতখানি তা আর স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেবার উপায় ছিল না। বস্তুত প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কোনো স্বীকৃতিতে তাঁর তেমন আগ্রহও লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি যশে বীতস্পৃহ উদাসীন পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা পিতা ও তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তার বাইরে কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে তিনি কখনো ব্যগ্র হননি। নয়তো, তাঁর পিতার কীর্তির কাছে নিষ্প্রভ হলেও সে স্বাক্ষর সম্পূর্ণই জলের লিখন নাও হতে পারত।

বাংলাদেশে আজ একটি প্রবল তর্ক, বাংলায় বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে কিনা। রথীন্দ্রনাথ যদি অভিনিবেশ সহকারে উদ্‌যোগ করতেন তবে তাঁর অধীত বিজ্ঞান বিষয়কে বাংলাভাষায় বহুজনবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করতে পারতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ক্ষমতার উজ্জ্বল দুটি প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন—'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮) ও 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২)। এ দুটি বই-ই তাঁর পিতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত; বোধ করি আত্মপ্রকাশের দ্বিধাকে এইকালে তিনি একটুখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন। গুণগ্রাহী ইউসুফ মেহেরালি ও বিশ্বভারতীর কোয়ার্টার্লির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির একান্ত আগ্রহে তিনি ইংরাজীতে On the Edges of Time আখ্যায় যে আত্মজীবন স্মৃতি রচনা করেছিলেন আত্মকে অন্তরালে রেখে জীবনস্মৃতি রচনার তা একটা পরম দৃষ্টান্ত।

কর্ম বা অন্য সূত্রে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও ঘটেছিল আশা

করি তাঁরা অন্তত এ কথা স্বীকার করবেন যে, সেইজন্যে তাঁর সমতুল্য মানুষ বিরলদর্শন। আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন লোক ব্যবহারে তাঁর গভীর ধৈর্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানে ভিন্নমত পোষণ ও প্রকাশ করবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি অব্যাহত ছিল। শান্তিনিকেতনের কর্ম পরিচালনায় রথীন্দ্রনাথকে কখনো কখনো সহকর্মীদের কঠিন সমালোচনার ভাজন হতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে এ সকল সমালোচনার সংগত কারণ ছিল, তাঁর মতের প্রতিকূলতা কাজে বা কথায় যাঁরা করেছেন তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে তা করেন নি শান্তিনিকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাবশতই তা করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল এই যে, কঠিন সমালোচনার ফলে মনে যতই পীড়া বোধ করে থাকুন, বাক্যে বা ব্যবহারে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ধৈর্য তাঁকে রক্ষা করতে হয়নি। ধৈর্য তাঁর সহজাত ভূষণ ছিল।

মানুষের চরিত্রের এই সকল গুণ জীবনান্তে কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন রেখে যায় না ; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সহজ সৌজন্য ও বিরল ধৈর্যের ফলভোগী যাঁরা হয়েছেন জীবনে নানা অভিজ্ঞতার দিনে তাঁরা বারে বারে তাঁকে স্মরণ করবেন, তিনি কোন অবিস্মরণীয় সাহিত্য বা শিল্পকীর্তি না রেখে গেলেও।

লেনার্ড কে. এলম্‌হার্স্ট

মহাপ্রতিভাবান পিতার পুত্রের পক্ষে সহজ জীবনযাত্রা কদাচই সম্ভব হয়ে থাকে। আর রথীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই মাতৃহীন হয়েছিলেন সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। বাল্যে ও কৈশোরে জীবন সম্বন্ধে যে স্বপ্ন যে আশা আকাঙ্ক্ষাই তাঁর থাকুক, পিতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার চেষ্টাতেই চিরদিন তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। রথীদাকে আমরা যারা জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি নিজের অভিলাষ—আকাঙ্ক্ষাকে একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর কবি-পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।

অভিজাত সুলভ তাঁর শান্ত মুখশ্রীর অন্তরালে ছিল শিল্পীর হৃদয়—কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ করবার সময় সুযোগ তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা বিশ্বভারতীর নানা আর্থিক ও আইনগত প্রশ্নের আলোচনায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাঁর স্টুডিও, তাঁর ছোট কারখানা ঘর, তাঁর উদ্যান-চর্চার কাজে দেবার সময় তিনি সামান্যই পেয়েছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যরূপে তাঁর গুরুতর শ্রম ও চিন্তার

বিবরণ ইতিমধ্যেই ধূলিধূসর ফাইলে চাপা পড়েছে—তাঁর দু-চারজন পুরাতন বন্ধুই কেবল সে কথা স্মরণ রাখবেন। আর, এরই মধ্যে তাঁর শিল্পী মন কখনো ছাড়া পেয়েছে—শিল্পরূপেই হয়তো তাঁর স্মৃতি সঞ্জীবিত থাকবে।

জাপানের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক চা-পান উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছেন ; অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে ব্যবহৃতপাত্রগুলির বিশেষ সৌন্দর্য কোথায় সেগুলির ইতিহাস কী, তা রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চীনা কবি সু-সী-মো ও আমরা অন্য যারা উপস্থিত আছি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝান হচ্ছে। সর্বশেষে অনুষ্ঠানপতি বাঁশের তৈরী সুগঠিত একটি লম্বা চামচের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যেটি দিয়ে চায়ের পাত্রে চায়ের পাতা তুলে দেওয়া হচ্ছিল—প্রায় তিনশ বছর আগে জাপানী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এটি তৈরী করেছিলেন। সৈন্যাধিনায়ক রূপে তিনি কৃতকর্মাই ছিলেন, কিন্তু সেসব বিবরণ কারো আজ আর মনে নেই. তিনি নিজের হাতে যে বাঁশের চামচ তৈরী করতেন সেগুলির সুন্দর গড়নের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ চামচ তারই একটি।

রথীদাও নিজের হাতে কাঠের কাজ করতে ভালবাসতেন। তিনি একজন কুশলী কারুশিল্পী ছিলেন—তাঁর আঁকা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর রচনা পড়েছেন, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁর প্রকাশ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করবেন। উত্তরায়ণের উদ্যানও তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টি।

তাঁকে ঘিরে সেকালের অনেক স্মৃতি আজ মনে পড়ছে—নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, টেনিস খেলা, দিনেন্দ্রনাথের চায়ের আসর, কলাভবনের ছাত্রদের বনভোজন, আগুন পোহানো, চন্দ্রালোকিত রজনীতে দুমকা অভিযান—সবচেয়ে মনে পড়ে শ্রীনিকেতনকে প্রথম থেকে গড়ে তুলবার দিনে সমিতিতে আলাপ আলোচনা। এক সন্ধ্যায় পিঠাপুরমের সুবিখ্যাত বীণাবাদকের বাজনা রথীদা সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে কী অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। মাতৃভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিমাণের বিষয় মন্তব্য করতে আমি অধিকারী নই, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে চর্চা করলে ইংরাজীতে লেখক রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্ররূপে পিতার কাছে দীর্ঘ দিনের শিক্ষায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করতে তিনি শিখেছিলেন। আমাদের দুঃখ রয়ে গেল যে তাঁর বিচিত্র ক্ষমতা, ঐকান্তিক নম্রতা বশত যার আড়ম্বর তিনি আমাদের

কাছে কখনো করেননি, তার পূর্ণ ব্যবহার করবার সময় ও অবসর তিনি পেলেন না।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(সেই নেপথ্যচারী মানুষটি)

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে কাটিয়েছেন, শেষ নিশ্বাসটিও ত্যাগ করলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। ভিড়ের মানুষ ছিলেন না, হৈ চৈ ভালবাসতেন না। সমস্ত দেশ যখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের কলরবে মুখর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে নিঃশব্দে চলে গেলেন। শান্তিনিকেতনেও দেখেছি উৎসব কোলাহল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতেন। জীবনভোর সমস্ত কাজই নিঃশব্দে করেছেন, কখনও কোন ব্যাপারে তাঁকে ত্রস্ত ব্যস্ত হতে দেখিনি। কাঠের কাজ কিংবা চামড়ার কাজ করবার ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে মৃদুস্বরে কাজকর্মের নির্দেশ দিতেন। প্রখর বুদ্ধি এবং সহজাত রুচিবোধের বলে কোন রকম সোরগোল না করে দিব্য শৃঙ্খলার সঙ্গে সব কাজ করতেন। একটা যে কাজ চলছে এবং বড় রকমেরই কাজই চলছে তা মোটেই টের পাওয়া যেতো না। কাজেই তাঁর পরলোকগমনের সংবাদে যে কথাটি সর্বপ্রথম আমার মনে হয়েছিল সেটি এই যে—ইনি বরাবর জীবনের একটি ছন্দ বজায় রেখে চলেছিলেন, মৃত্যুতেও তাঁর ছন্দপতন হয়নি।

চিরকাল নেপথ্যচারী মানুষ, মৃত্যুও ঘটল নেপথ্যে। এমন কি জয়ন্তী উৎসবের কোলাহলে মৃত্যু সংবাদটিও সহজেই ডুবে গেল। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির দীপ্তি অনুচর পরিচর সকলের উপরই অল্পবিস্তর পড়েছিল, সবচেয়ে কম পড়েছে রথীন্দ্রনাথের উপরে কারণ তিনি থাকতেন সকলের পিছনে। জনতার দৃষ্টি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলতেন। এমনভাবে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারাও একটা আর্ট। পিতা যতদিন ছিলেন ততদিন নিজস্ব জীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না। পিতার কর্মেই একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই আত্মবিলোপের মর্যাদা অপরে কতখানি বুঝেছে জানি না কিন্তু স্নেহশীল পিতা অবশ্যই তার মূল্য বুঝেছিলেন। পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

কর্মের যেখানে উচ্চদাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাক একপাশে।

কোন কালে এতটুকু আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেননি। এই প্রচার সর্বস্ব যুগে এটিকে আমি যথার্থই মহৎ গুণ বলে মনে করি। অল্পদিন পূর্বে ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁর আত্মচরিত মূলক যে গ্রন্থখানি (অন্ দি এজেস অব্ টাইম) প্রকাশিত হয়েছে তাতেও প্রধানতঃ পিতার কথাই লিখেছেন, নিজের কথা সামান্যই বলেছেন। আজীবন পিতৃগৌরবেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন; অথচ নিজে যেসব গুণের অধিকারী ছিলেন তাতে নিজ গুণেই তিনি জীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, প্রাণতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কৃষিবিদ্যায় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেছিলেন, উদ্যান রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহ ছিল—অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিতের অনুবাদ তার নিদর্শন। চিত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য না হলেও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কাঠ এবং চামড়ার কাজে বিশেষ করে কাঠের কাজের যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাকে প্রতিভা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইদানিং সিমেন্টের সাহায্যে নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুতের পরীক্ষায় নাকি নিযুক্ত ছিলেন। শুনেছি বলেছিলেন: এবার ছুতোরের কাজ ছেড়ে আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করেছি।

এই সূত্রে বহুদিন পূর্বে শোনা তাঁর একটি উক্তি মনে পড়ছে। আমাদের কর্মিমণ্ডলীর সভায় একবার নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: 'জন্মেছি শিল্পীর বংশে শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচি আর ছুতোরের'। কথাগুলি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজেকে অকিঞ্চন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা তাঁর স্বভাবগত ছিল, সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এখানে এই কথা কটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তিনিই মূলত সাহিত্যিক। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক সময় সাহিত্যিক প্রসাদগুণ প্রকাশ পেত। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট মনোযোগ দেননি, এটি পরিতাপের বিষয়। ইংরাজী বাংলা কিছু কিছু লেখা এককালে তিনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। পিতার অসামান্য প্রতিভায় তার মন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন ছিল, বোধ করি এই কারণেই আপন ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন কালেই আস্থা আসেনি। ফলে ঐ সব লেখার বেশির ভাগই অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছে।

সংসারে অনেক রকমের ত্যাগ আছে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপরের সেবায় আপন সম্ভাবনার বিলোপ সাধন যে কতখানি ত্যাগ সে সব কথা সব সময় আমরা মনে রাখি না। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন: আমার নিজস্ব জীবন আমি কোনকালে যাপন করিনি। বলা বাহুল্য, কথাটি ওঁর মুখে বড়ো করুণ

শুনিয়েছিল। যা হোক এখানে কেবল আত্মবিলোপের কথাই বলছি না সাংসারিক অর্থে আমরা ত্যাগ বলতে যা বুঝি সে কথাই বলছিলাম। একদা যে সব কর্মী এবং অধ্যাপক নামমাত্র বেতনে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের আদর্শবাদ এবং স্বার্থত্যাগের কথা অনেকে অনেক সময় বলেছেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ যে বিনা বেতনে বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন সে কথার উল্লেখ খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি। এছাড়া আরও কোনো কোনো কথা আমরা সব সময়ে মনে রাখি না কিংবা ভেবে দেখি না। রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতার বিত্ত এবং সম্পত্তির উপরে পুত্রের অধিকার আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারীর নিশ্চয় তাতে সায় ছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী বহু লক্ষ টাকাব সম্পত্তি—তিনি বিশ্বভারতীকে দান করলেন। তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সাগ্রহ সম্মতি না থাকলে কি কখনও তা সম্ভব হত ? এ সব তো বড় ছোট খাট ত্যাগ নয়। কিন্তু এই ত্যাগের কথা দেশবাসীর মুখে কখনও উচ্চারিত হয়েছে বলে আমি শুনিনি। দেশবাসী বলেনি, কিন্তু পুত্র যে তাঁর ন্যায্য পাওনা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন পিতা সেজন্য নিঃসন্দেহে গর্বিত বোধ করেছেন, আশীর্বাদ করে বলেছেন—

> সেদিন ভোজের পাত্রে রাখনি ভোগের আয়োজন
> ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।

ঋণের দায়ে জমিদারি গত-প্রায়। আয়ের অঙ্ক হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে আসছে। এই অবস্থাতেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে যে সব বিদেশী অধ্যাপকদের এখানে আনানো হয়েছিল তাঁদের যাতায়াত, রাহা খরচ ইত্যাদি ব্যাপারে রথীন্দ্রনাথকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, একথা নিজ মুখেই একদিন আমাকে বলেছিলেন। শ্রীনিকেতনের নানা বিভাগের মধ্যে শিল্পসদন বিভাগটি বলতে গেলে তাঁর এবং প্রতিমা দেবীর নিজ হাতে গড়া জিনিস। চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্পের কাজ, বাটিকের কাজ এঁদের দুজনের উৎসাহেই শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় এর জন্যও রথীন্দ্রনাথকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য সেটাই বড় কথা নয়, কিংবা একমাত্র কথা নয়। আমার মতে শ্রীনিকেতন শিল্পসদনের সঙ্গে প্রতিমা দেবী বা রথীন্দ্রনাথের নাম এই কারণে গ্রথিত থাকা উচিত যে বাংলাদেশের রুচি গঠনে এই শিল্পসদন বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে।

শ্রীনিকেতনের শিল্প সামগ্রীর অনুকরণ আজ দেশময় চলছে—এর মূলে কে, কার উৎসাহে এবং উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল একদিন হয়তো দেশবাসী তা ভুলে যাবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রথীন্দ্রনাথের ন্যায় শোভন রুচিসম্পন্ন মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। গৃহনির্মাণে, গৃহসজ্জায় এবং উদ্যান রচনায় তাঁর সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পী মনের পরিচয় সুস্পষ্ট ছিল।

...বিশ্বভারতীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বহু বৎসর কর্মসচিব রূপে তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। পরে যখন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল তখন তিনিই হলেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। মাত্র দুটি বৎসর উপাচার্যরূপে বিশ্বভারতীর কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তারপরে অকস্মাৎ তিনি কার্যভার ত্যাগ করে চলে যান। রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন আর শান্তিনিকেতনে এত দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল যে আজ তাকে শান্তিনিকেতন বলে চেনাই দুষ্কর। রবীন্দ্রসংগীতের যেমন একটি নিজস্ব গায়কী আছে শান্তিনিকেতনের জীবনেও তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি তার জীবনধর্ম। শান্তিনিকেতনের মর্ম যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা জানেন যে Santiniketan is nothing if not a particular way of life সেই জীবনধারাটি বিনষ্ট হতে চলেছে।

রবীন্দ্র সংগীতে তান বা স্বরবিস্তারের অবকাশ নেই, বেশি মোচড়াতে গেলে কোমল স্বভাব গানটির পাছে মর্মপীড়া ঘটে সে ভয় তাঁর ছিল। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধেও ঐ কথাটি খাটে। এর মধ্যে এমন কোনো জিনিসের অন্তর্ভুক্তি তিনি চাননি যা এর স্বভাববিরুদ্ধ। বলতে গেলে সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা একটি পাঠক্রমকে অবলম্বন করে, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা একটি জীবনধারাকে আশ্রয় করে। সেই মূল কথাটি স্মরণ রাখা হয়নি। এর ফল বিষময় হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ যতদিন কর্মকর্তা ছিলেন ততদিন তিনি একটি সংগতি বা লয়রক্ষা করেছিলেন। কালক্রমে আকারে প্রকারে নানা পরিবর্তন আসতেই পারে কিন্তু তার মধ্যেও সংগতি রক্ষার প্রয়োজন আছে। রথীন্দ্রনাথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগতি বোধটি চলে গেল। ফলে শান্তিনিকেতনের জীবন সুরে লয়ে তালে সংগতির অভাবে কেমন যেন বেসুরো বাজতে লাগল। তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধ, সৌজন্যবোধ এবং কর্মকুশলতা শান্তিনিকেতনের জীবনকে আশ্চর্য এক সুষমা দিয়েছেন। এ যে কত বড়ো কৃতিত্বের কথা একটি কথা বললেই তা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও বার বৎসর কাল তিনি বিশ্বভারতীর সর্বময় কর্তা ছিলেন। শান্তিনিকেতনের জীবনধারাটি অব্যাহত এবং শান্তিনিকেতন জীবনের

লাবণ্যটিকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন বলেই কবি-প্রয়াণের এত বড়ো শূন্যতাও সেদিনকার শান্তিনিকেতনের জীবনে ততখানি প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ কার্যভার ত্যাগ করে যাবার অনতিকাল মধ্যেই শান্তিনিকেতনের জীবনখানি এতখানি শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল যে তাঁর অভাবটিও সকলে স্পষ্টতঃ অনুভব করেছেন।

নানা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। নিজে গুণবান বলেই তিনি গুণের সমাদর করতে জানতেন। কর্মীদের কার কি গুণ আছে তার সব খবর তিনি রাখতেন। তাঁর কার্যকালে সত্যিকারের কোন গুণী ব্যক্তির অনাদর হয়েছে এমন কথা আমি কখনো শুনিনি।

…বিশ্বভারতীর যিনি উপাচার্য তিনি আমাদের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর কাজে সাহায্য করা আমাদের নিয়মিত কর্তব্যের অন্তর্গত। কিন্তু এমনি তাঁর সহজাত সৌজন্য যে সামান্যতম কাজের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না….

….আজীবন নেপথ্যবাসী ব'লে তাঁর অনেক গুণের কথা এখানকার অধিবাসীরাও জানেন না। নানাজনেব মুখে শুনেছি বিপদে আপদে নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করতেন কিন্তু সমস্তই গোপনে। ডান হাতে যা দিতেন, বাঁ হাতও তা টের পেত না।

যে মানুষ সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছেন আজ যখন তিনি লোকান্তরে চলে গিয়েছেন তখন লোকসমক্ষে তার গুণকীর্তন করে লাভ কি? লাভ তাঁর না, আমার। জীবদ্দশায় প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে গেলে তিনি কতখানি কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হতেন সে আমি অনায়াসে অনুমান করতে পারি। কিন্তু লজ্জা এবং কুণ্ঠা এক আধটু আমাদেরও তো থাকবার কথা। গুণমুগ্ধ এবং স্নেহস্নিগ্ধ সহকর্মী হয়েও তাঁর সম্পর্কে কোনদিন যে একটি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিনি সে দুঃখ এবং লজ্জা আজ রাখব কোথায়? মনকে কি দিয়েই বা প্রবোধ দেব।

হৃষীকেশ চন্দ

তখন শান্তিনিকেতনে অর্থ ছিল না। ছিল কাজ করবার পর্যাপ্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা। বস্তুত রথীদা যতদিন বিশ্বভারতীর সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন ততদিন কখনো পরের চাকুরী করেছি এ অনুভূতি মনে জাগেনি।

কখনো মনে হয়েছে কোন একটা কাজ করলে শ্রীনিকেতনের উন্নতি হতে পারে। রথীদার অনুমতি প্রার্থনা করলে বলেছেন, আমি এসব কথা শুনতে চাই

না। যা মনে কর তাই করে ফেলবে, পরে আমার অনুমোদন চেয়ে নিও।

এমনি ছিল কাজের অবাধ স্বাধীনতা ! কোন একটা ভাল কিছু করতে পারলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তাতে কত না উৎসাহ পেতাম। কর্মক্ষমতাও কত বেড়ে যেত।

রথীদার কাছে সমগ্র বিশ্বভারতীর ছোটবড় সব কর্মী ছিল যেন একটি পরিবারভুক্ত। সকলের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা, সুখদুঃখের খবর রাখতেন. বিপদে অযাচিতভাবে এগিয়ে আসতেন সাহায্যের জন্য, এ আমি কতবার নিজের চোখে দেখেছি।

বিশ্বভারতীর কিভাবে উন্নতি হতে পারে এ ভাবনাই অহরহ তাঁর মনে সমস্ত সময় জুড়ে থাকত।

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ছিল গুরুদেবের, কিন্তু তার রূপ দেবার, তাকে বাস্তবায়িত করবার সমস্ত দায়িত্ব ছিল রথীদার। সার্থকভাবে তিনি তা করেও গিয়েছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট মায় গাছপালা বাগান কোথায় কি ভাবে হবে সমস্ত তাঁর গভীর চিন্তা ও সুপরিকল্পিত কর্মের ফলে গড়ে উঠেছে। এর প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বর্তমান বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে তাঁর অবদানের কথা আর ক'জনে মনে করে।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সমানভাবে তাঁর মন জুড়ে থাকত। এই দুই জায়গায় কর্মযজ্ঞের ধারা ভিন্ন ছিল। কিন্তু তাঁর কাছে তাঁদের মূল্য ছিল এক, অবিভাজ্য।

তিনি ছিলেন একাধারে কর্মী, শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে তাঁর এই সব রূপেই তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শেষের দিকে দেরাদুনে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে একটানা চার মাস ছিলাম। তাঁর স্টুডিও ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি তখন ছবি আঁকতেন, আমি অনেক সময় চুপ করে তাঁর পাশে বসে থাকতাম। তিনি আপন মনে বিশ্বভারতীর কত কথা, গুরুদেবের কত কথা, নিজের পারিবারিক কথা বলে যেতেন। কখনও বা তাঁর স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাতেন।

তিনি ছিলেন সুলেখক। যে কয়খানা বই তাঁর আছে তাতে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় এস্রাজ বাজিয়ে গান করেছেন। তাঁর অজস্র লেখা পড়ে শুনিয়েছেন। শেষের দিকে শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন। তার

অধিকাংশই আমাকে শুনিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর সেখানা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। থাকলে আজ একখানা মহা মূল্যবান গ্রন্থ হয়ে থাকত।

শান্তিনিকেতনের জন্য ছিল তাঁর প্রাণের টান। জীবনের শেষের দিকে দেরাদুনে প্রায় নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর দেরাদুনের 'মিতালি' বাড়ীখানা ছিল শান্তিনিকেতনের 'উদয়নের' ক্ষুদে সংস্করণ।

বাগানে ছিল লতানো আম, জাম, পেয়ারা ও নানাবিধ মূল্যবান সংগ্রহের সমারোহ, ঠিক যেমনটি ছিল তাঁর উত্তরায়ণে।

গাছপালার প্রতি আকর্ষণ ছিল অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে নানা মূল্যবান বৃক্ষের বীজ, চারা সংগ্রহ করে এনে সযত্নে বড় করে তুলে ছিলেন উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে, শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন স্থানে।

উত্তরায়ণে তাঁর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মূল্য এবং মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। অবহেলায় ও অযত্নে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।

দেরাদুনের বাড়ীতেও একটি বাগানের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তার পরিণতি কি হয়েছে জানি না। কতদিন তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এসব বৃক্ষের ইতিবৃত্ত শুনেছি। বৃক্ষ শিশু তাঁর কাছে একটি মানব শিশুর মতই প্রাণবন্ত ছিল।

দেরাদুনের বাড়ীতে তিনি বহু কষ্টে সংগ্রহ করে একটি নীল পদ্ম এনে বাগানের ছোট লেকে পুঁতেছিলেন। একদিন ভোরে তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠের আহ্বানে ছুটে গিয়ে দেখি একটি পদ্মকোরক উঁকি মারছে। তিনি ভীষণ উত্তেজিত। হিসাব করা গেল কবে নাগাদ পদ্মটি পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে। সেদিন শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চায়ের আমন্ত্রণ করা হল। স্থান হল পদ্মপুকুরের ধারে। বিকালে প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ উপভোগ করতে করতে মিষ্টি মুখ করা হল। তিনি দিনভোর যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে কাটালেন।

তিনি যে কতবড় বোটানিস্ট ছিলেন সে খবর কজনেই বা জানত। তিনি যে বৃক্ষলতাকে কত ভালবাসতেন তা প্রকাশ পেত যখন তিনি এই পরিবেশে একাকী ঘুরে বেড়াতেন।

তিনি যে কত দক্ষ দারুশিল্পী ছিলেন তার কিছুটা নিদর্শন রয়েছে উত্তরায়ণে। খোদাই কাজেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাঠের পাটার স্বাভাবিক আঁশের মধ্যে কিছু সংযোজন করে কত অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন।

উত্তরায়ণে তাঁর গুহাঘরের একটি কামরায় কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা

চালাতেন। দেরাদুনের বাড়ীতেও এমনি একটা ওয়ার্কসপ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলাম। সেখানেও তিনি নিয়মিতভাবে কাজ করতেন। এ সময় তাঁর মুখে একটা অপূর্ব প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরাট মহীরুহের মত। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় শিল্পী কবি রথীন্দ্রনাথ নিজেকে অবলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর বহুবিধ গুণাবলীর নিদর্শন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে আজ হারিয়ে গেছে।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(রথীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী)

রথীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে পাশে না দাঁড়ালে প্রত্যক্ষে বিরোধিতা বা পরোক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বাধা-সৃষ্টি করলে কবির মানস-সন্তান বিশ্বভারতী আদৌ জন্ম নিত কিনা এবং জন্ম নিলেও নানা দুর্যোগের মধ্যে আত্মরক্ষা করে এতদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে রচিত পিতার আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ; তাঁর বিশ্বভারতীর প্রথম যুগ্ম কর্মসচিবের অন্যতম, তাঁর দেশবিদেশাগত অতিথিদের নিরলস সেবক; তাঁর মৃত্যুর পর সঙ্কটাবর্তে পতিত বিশ্বভারতীর অতন্দ্র কর্ণধার এবং স্বাধীন ভাবতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য।

রথীন্দ্রনাথের পরম সৌভাগ্য এবং চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। মহাকবি মহাপ্রাণ পিতার সাহচর্যে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি অন্তরের দিক দিয়ে অনেক লাভ করেছিলেন, তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হয়ে দেশবিদেশ ঘুরে তিনি অনেক বড়ো মানুষ ও বড়ো জিনিস দেখেছিলেন এবং শিখেছিলেন তেমনি। এও সত্য যে তাঁর শিল্পিসত্তার সম্যক স্ফুরণের সুযোগ তিনি পাননি এবং নিজের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিজয়ী পিতার অভ্রচুম্বী ব্যক্তিত্বের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান কোনদিন পাননি। কাজ করতে গেলেই মানুষের দোষত্রুটি হয়, নিজের মতে চলতে গিয়ে ভিন্ন মতের সহকর্মীদের অপ্রিয় কাজও অনেক সময় করতে হয়, একটা বিশাল প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে। বিশ্বভারতীর কোন কাজে কোন ভুল বা স্খলন হলে তার জন্য রথীন্দ্রনাথ নিন্দিত হয়েছেন এবং প্রশংসনীয় কাজের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পুত্র যে তাঁর জন্য নিজের প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না, তিনি যে পিতার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করছেন তা আর কেউ না বুঝলেও

রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন, সেজন্য তাঁর মনে কুণ্ঠা ছিল, কিন্তু কিছু করবার উপায় ছিল না। তাই তিনি রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছলেন

'বিদায় প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র 'পরে।'

১৯০২ সাল থেকে কবি তাঁর মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে পিতার এবং মাতার স্নেহ দিয়ে লালন করেছিলেন, কিন্তু তাদের কাউকে অন্যায় প্রশ্রয় দেননি। পনেরো বছরের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'বিলাসিতার ধনাভিমানের মোহ যেন তোকে স্পর্শ না করে। বাহিরের বিরলতা ও অন্তরের পরিপূর্ণতা ভারতবর্ষের আদর্শ, সেই আদর্শ তোকে গ্রহণ করিতে হইবে। মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে মহৎ ভার গ্রহণের সর্বপ্রকার উপযুক্ত করিতে হইবে। রথীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁর কথা রাখতে।

১৯২১ সালের ২২শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে তাঁর শান্তিনিকেতনের জমি, বাড়ী ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব দান করেন। রথীন্দ্রনাথের এ ব্যাপারে সম্মতি থাকলেও তাঁর পক্ষে হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী অভিযোগ করলেন রথীকে এভাবে তাঁর প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা তাঁর উচিত হচ্ছে না। তাঁর পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি যে সম্পদকে বড় বলে জানি অথচ নিজের জীবনে যাকে সম্পূর্ণ লাভ করবার সুযোগ পাইনি সেই সম্পদের অধিকার রথীর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা না করে আমি থাকতে পারি নে। ....নিজের বিষয়ের দিকটাতে আমি খুবই ছোট সেখানে আমি বিষয়ী আমি হিসেবী....আমি দ্বারকানাথের পৌত্র এবং বিরাহিমপুরের জমিদার...কিন্তু সেইখানেই বাঁধা পড়ে থাকতে পারব না এবং কাউকে বাঁধা পড়ে থাকতে বলব না।'

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সেবা করেছেন, এর মধ্যে বহুজন নানাভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, আমিও হয়েছি। ছাত্ররূপে এবং কর্মীরূপে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার, সহৃদয়তার সৌন্দর্যপ্রীতির ও দায়িত্ববোধের বহু পরিচয় পেয়েছি। ১৯২৯ সালে যখন আমরা উত্তরায়ণে জাতীয় পতাকা তুলতে না দেওয়ায় তাঁকে "কাপুরুষ" বলেছিলাম, তখন জানতুম না কৈশোরে গিরিডির বাজারে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে তিনি মারোয়াড়ির হাতে মার খেয়েছেন, গিরিডিতে এবং কলকাতার পথে পথে দল বেধে স্বদেশী গান গেয়েছেন, দিনের

পর দিন দেশের কাজের জন্য চাঁদা তুলেছেন, অনুশীলন সমিতির আখড়ায় বিপ্লবী ছেলেদের জুজুৎসু শিখিয়েছেন। বিশ্বভারতীর স্থায়িত্বরক্ষার ভার নেবার পর দায়িত্ববোধ তাঁকে হঠকারিতায় বাধা দিয়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির শত্রুতা ডেকে এনে পিতার অমতে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করবার তাঁর সেদিন অধিকার ছিল না।

আমাকে তিনি দুর্দিনে ডেকে নিয়ে লোকশিক্ষা সংসদের ভার দিয়েছিলেন, কাজে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নীতিগত বিরোধে আমি চাকরী ছাড়তে চাইলে তিনি আমার কটূক্তি সহ্য করে মিষ্ট কথায় আমাকে শান্ত করেছেন, সম্মান শর্তে বিরোধের মীমাংসা করেছেন। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে তিনি বহু আশ্রয়প্রার্থী অপরাধীকে ক্ষমা করেছেন, কর্মীদের রোগে অভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন। কর্মক্ষমতায় পিতৃভক্তিতে এবং সহজ সৌজন্যে তিনি তাঁর পিতাকে অতিক্রম করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। সঙ্গত ও অসঙ্গত কঠিন সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে ধৈর্যচ্যুত হতে দেখেছি, কিন্তু রথীন্দ্রনাথকে কোনদিন রাগতে দেখিনি। জবাহরলাল তাঁকে রাজদূতের পদ দিয়ে বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন, আরামের চাকরী প্রচুর অর্থ ও সম্মান। সে লোভ তিনি জয় করেছিলেন বিশ্বভারতীর ক্ষতি হবে বলে। যদিও শিল্পসৃষ্টির শখের জন্য অর্থাভাব তাঁর লেগেই থাকত।

শেষ বয়সে একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে মনে আঘাত পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান, দেরাদুনের কাছে রাজপুরে গৃহনির্মাণে শিল্পকর্মে এবং উদ্যান রচনায় জীবনের বাকী ক'বছর কাটান। প্রবাসে স্বেচ্ছানির্বাসনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আশ্রমের অনুরক্ত কর্মীদের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন চিঠিপত্রে। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কোন চেষ্টাই শান্তিনিকেতন বা দেশবাসী করেনি, নেপথ্যচারী নীরব কর্মী তাঁর জীবনের সাধনফল আমাদের জন্য রেখে নীরবেই বিদায় নিয়েছেন। তবে পিতার আশীর্বাদ তাঁর উপর ছিল, একদিন লোক তার মর্যাদা বুঝবে। বিশ্বাস রাখব কবির কথায়—

'মরে না, মরে না কভু সত্য মরিবার নহে।'